শাস্ত্রীয় ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধন

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ

মূল্য কাগজের কভার ১৲
" কাপড়ের বাঁধান - - ১।০

প্রাপ্তিস্থান

১। লেখক, দেবালয় ত্রিতল গৃহ,
২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২। চক্রবর্ত্তী চাটুর্য্যা এণ্ড কোং,
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শাস্ত্রীয় ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধন

উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্র, এই 'প্রস্থানত্রয়'-
প্রতিপাদিত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা

-০:⁐০:*:০⁐:০-

'প্রস্থানত্রয়ের' টীকাকার ও অনুবাদক এবং ধর্ম্মের দর্শন
ও সাধন-ব্যাখ্যায়ক বিবিধ গ্রন্থলেখক

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ-প্রণীত

কলিকাতা
২১১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ-
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৩৩

মুখবন্ধ

গোদাবরী প্রদেশের অন্তর্গত পীঠপুর* নগরের ধর্ম্মানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী মহারাজা সূর্য্যরাও বাহাদুরের আদেশানুসারে এই গ্রন্থ লিখিত এবং তাঁহার অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। মহারাজার পরম বন্ধু ব্রহ্মর্ষি বেঙ্কট-রত্নমের সপ্ততিপূর্ত্তির উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া গত আশ্বিন মাসে উক্ত রাজধানীতে গিয়াছিলাম। মহারাজার সহিত শেষ সাক্ষাতের দিনে তিনি আমাকে বলিলেন,—"প্রস্থান-ত্রয়-প্রকাশ তো সম্পূর্ণ হইল। এখন প্রস্থানত্রয়ের ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া এক খানা পুস্তক লিখিলে ভাল হয়। বই-খানা এদেশীয় লোকের মাতৃভাষায় লিখিত হইলেই সহজ-বোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী হয়। আপনি বাঙ্গালায় লিখুন, সেই ভাষায় অভিজ্ঞ এখানকার কোন লেখককে দিয়া আমরা ইহা তৈলঙ্গী ভাষায় অনুবাদ করাইয়া লইব। আপনি বা আপনার মনোনীত কোন ব্যক্তি ইহা ইংরেজীতে অনুবাদ করিতে পারেন। আমি তিন খানা পুস্তকেরই প্রকাশব্যয় বহন করিব।" মহারাজার প্রস্তাবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও বিস্মিত হইলাম। বিস্ময়ের কারণ এই যে তিনি আমার

---

* একটী পীঠস্থান। জনশ্রুতি অনুসারে মহাদেব-কর্ত্তৃক নিহত তাড়কাসুরের একটী অঙ্গ এখানে পতিত হইয়াছিল।

দীর্ঘকাল পোষিত অথচ অব্যক্ত একটা ইচ্ছা আশ্চর্য্যরূপে ব্যক্ত করিলেন। দর্শন ও শাস্ত্রব্যাখ্যা-সম্বলিত আমার অনেক ইংরেজি গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মর্ষি বেঙ্কটরত্নমের যত্নে এবং মহারাজার অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালা বই সম্বন্ধে তাঁহাদের পরামর্শ বা সাহায্য কখনও আশা করি নাই। যাহা হউক্, আশাতীত প্রস্তাব শুনিয়া উৎফুল্লচিত্তে প্রস্তাবিত গ্রন্থ অবিলম্বে লিখিতে সম্মত হইলাম। ঈশ্বর-কৃপায় অল্প সময়ের মধ্যেই লেখা ও ছাপা শেষ হইয়া অতি শুভ সময়ে পুস্তকখানা প্রকাশিত হইল। এখন চারিদিকেই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের শত-বার্ষিকীর আয়োজন চলিতেছে। রাজা ভারতের সর্ব্বাঙ্গিন সংস্কার ও উন্নয়ন রূপ মহাব্রত গ্রহণ করিয়া নানা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল ভারতীয় প্রাচীন ব্রহ্মবাদের পুনরুদ্দীপন ও সংস্কার। তিনি জানিতেন ব্যক্তিগত ও সামাজিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা। ইহাও জানিতেন যে ব্রহ্মবাদ স্বাভাবিক ও সর্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম হইলেও ভারতেই ইহা গভীরতম আকার ধারণ করিয়াছিল। এই জন্যই তিনি শঙ্করাদি পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনুসরণপূর্ব্বক প্রস্থানত্রয়ের ব্যাখ্যা অবলম্বনে ভারতীয় ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধন পুনঃ প্রবর্ত্তিত করেন। সম্প্রতি শতবার্ষিকীর আয়োজনে ও বিবিধ অনুষ্ঠানে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ রাজার ধর্ম্মমত, ধর্ম্মাদর্শ এবং তৎপূজিত

শাস্ত্রসমূহের সারমর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। আশা করি এই পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও তাঁহাদের এই চেষ্টার কিঞ্চিৎ সহায়তা করিবে। এই আশা আংশিক ভাবে পূর্ণ হইলেও জীবনের সন্ধ্যাকালীন এই লিখনশ্রম সফল বোধ করিব।

২৩এ শ্রাবণ, ১৩৪০। গ্রন্থলেখক

সূচীপত্র

শাস্ত্রীয় ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধন

প্রথম অধ্যায়—শাস্ত্র

বেদ ও বেদের বিভাগ

ভারতের প্রাচীনতম ও পূজ্যতম শাস্ত্র বেদ। বেদে পদ্য, গান ও গদ্য, এই তিন প্রকার রচনা-প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। রচনা-প্রণালী ভেদে মূল বেদমন্ত্র 'ঋক্,' 'সাম' ও 'যজু,' এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক ভাগ এক একটী 'সংহিতা' রূপে পরিণত হয়। এই বিভাগ ও আকার হইতে বেদের অপর নাম হয় 'ত্রয়ী'। পরবর্ত্তী সময়ে এমন কতিপয় মন্ত্র আবিষ্কৃত বা রচিত হয় যাহা উক্ত কোন সংহিতাতেই স্থান পায় নাই। এসকল মন্ত্র প্রধান সংগ্রাহকের নামানুসারে 'অথর্ব্ব-সংহিতা' রূপে পরিচিত ও গৃহীত হইল। আরো পরবর্ত্তী সময়ে এই চারি সংহিতার ব্যাখ্যা এবং যজ্ঞানুষ্ঠানে মন্ত্রের প্রয়োগবিধি প্রভৃতি বিষয় লইয়া কতিপয় গ্রন্থ রচিত হইল। এই গ্রন্থগুলির নাম হইল 'ব্রাহ্মণ'। 'ব্রাহ্মণ'গুলি অধিকাংশ

স্থলেই গদ্যাত্মক। ব্রাহ্মণের কোন কোন অংশের নাম 'আরণ্যক'। বানপ্রস্থ সাধকগণকে বাহ্যোপকরণ ব্যতিরেকে মানস যজ্ঞ সাধনে সাহায্য করাই আরণ্যকের প্রধান উদ্দেশ্য। মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণের অপর কোন কোন অংশের নাম 'উপনিষদ্' বা 'বেদান্ত'। এসকল অংশের প্রধান উদ্দেশ্য ব্রহ্মের স্বরূপ ও সাধন শিক্ষা দেওয়া। বেদের মন্ত্রভাগে বহুদেববাদ ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মবাদ, দুইই আছে। কিন্তু উপনিষদ্‌ভাগেই ব্রহ্মবাদ বিশেষরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। 'মন্ত্র,' 'ব্রাহ্মণ,' 'আরণ্যক,' 'উপনিষদ্,' এই চারি প্রকার বৈদিক সাহিত্যেরই সাধারণ নাম 'শ্রুতি', অর্থাৎ যাহা গুরুমুখে শুনিয়া শিক্ষা করা হয়। বেদেতর ধর্ম্মসাহিত্যের সাধারণ নাম 'স্মৃতি,' অর্থাৎ প্রাচীন ঋষিদের শিক্ষা স্মরণ করিয়া যাহা বলা বা লেখা হয়। 'মন্ত্র', 'ব্রাহ্মণ' ও 'আরণ্যকে' ব্রহ্মজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এই জাতীয় সাহিত্যে যজ্ঞাদি কর্ম্মের বাহুল্য দৃষ্টে ইহাকে প্রধানতঃ 'কর্ম্মকাণ্ড' বলা হয়। কর্ম্ম জ্ঞানের সহায় হইলেও জ্ঞান সত্যের প্রকাশক বলিয়া কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, এই কারণে কর্ম্ম-প্রতিপাদক মন্ত্রাদি হইতে জ্ঞান-প্রতিপাদক 'উপনিষদ্' বা বেদান্তের শ্রেষ্ঠত্ব। 'বেদান্ত' শব্দের অর্থ বৈদিক সাহিত্যের অন্ত বা শেষ ভাগ, অথবা বেদার্থের মীমাংসা বা সারমর্ম্ম।

'উপনিষদ্' নামে এমন অনেক গ্রন্থ আছে যাহা

প্রকৃত পক্ষে বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত নহে, এমন কি যাহাতে বৈদিক মতের বিরুদ্ধ মতও আছে।

উপনিষদের শ্রেণীবিভাগ

সাধারণতঃ দ্বাদশ খানা উপনিষদ্‌কে বৈদিক ব্রহ্মবাদের শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করা হয়। তাহার বিশেষ কারণ এই যে ব্রহ্মবাদ-ব্যাখ্যায়ক প্রাচীন গ্রন্থ 'ব্রহ্মসূত্র' এসকল উপনিষদের প্রমাণ অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়াছে। এই দ্বাদশ খানার নাম,—ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর ও কৌষীতকি। এগুলির মধ্যে প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য ও শ্বেতাশ্বতর ছাড়া অপর আট খানার বৈদিকত্ব নিঃসন্দিগ্ধ; বেদের মন্ত্র বা ব্রাহ্মণাংশে এগুলির স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত চারি খানার বৈদিকত্ব সন্দিগ্ধ হইলেও এগুলিতে বৈদিক ঋষিদের ব্যাখ্যাত মত সমর্থিত হওয়াতে এগুলিকে 'আর্ষ উপনিষদ্' বলা হয়। 'মৈত্রী' উপনিষদ্‌ও আর্ষ উপনিষদের লক্ষণাক্রান্ত। কিন্তু 'জাবাল,' 'রামতাপনী,' 'নৃসিংহতাপনী': প্রভৃতি উপনিষদ্ স্পষ্টতঃই সাম্প্রদায়িক; কারণ এগুলিতে শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি সম্প্রদায়বিশেষের পূজ্য দেবতাকে ব্রহ্মের অবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং বেদ-বিরুদ্ধ প্রতিমাপূজা সমর্থিত হইয়াছে। শোনা যায় 'অল্লোপনিষদ্' নামক এক খানা গ্রন্থে মুস্লেম মত সমর্থিত হইয়াছে। আর্য্যেতর মত-প্রতিপাদক উপনিষদ্‌কে 'কৃত্রিম' বলা হয়। সুতরাং 'বৈদিক,' 'আর্ষ,'

'সাম্প্রদায়িক' ও 'কৃত্রিম,' এই চারি শ্রেণীর উপনিষদ্ প্রচলিত। তন্মধ্যে প্রথম দুই শ্রেণীর উপনিষদ্ই প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মবাদের সাহিত্য বা শাস্ত্র।

ব্রহ্মবাদের প্রস্থানত্রয়

উপনিষদ্-প্রতিপাদিত ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধন ব্যাখ্যা করিয়া অন্য অনেক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। সেসমুদায়ই ঔপনিষদ্ ধর্ম্মের সাহিত্য বা শাস্ত্ররূপে অল্পাধিক পরিমাণে সম্মানিত হয়। কিন্তু তন্মধ্যে দুখানাই বিশেষরূপে সম্মানিত ও অধীত হয়। সেই দুখানা 'ভগবদ্গীতা' ও 'ব্রহ্মসূত্র'। 'ভগবদ্গীতা'তে বিশেষ ভাবে ব্রহ্মবাদীর কর্ত্তব্য ও সাধনবিধি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'ব্রহ্মসূত্রে' শাস্ত্রীয় ও যৌক্তিক প্রমাণযোগে ব্রহ্মবাদ সমর্থিত ও ব্রাহ্মেতর মত খণ্ডিত হইয়াছে। 'উপনিষদ্,' 'গীতা' ও 'ব্রহ্মসূত্র'কে ভারতীয় ব্রহ্মবাদের 'প্রস্থানত্রয়' বলা হয়। 'প্রস্থান' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যাভেদ। উপনিষদ্ 'শ্রুতিপ্রস্থান,' গীতা 'স্মৃতিপ্রস্থান' এবং 'ব্রহ্মসূত্র' 'ন্যায়প্রস্থান'। আচার্য্য শঙ্করের সময় হইতে বৈদিক ধর্ম্মের অনেক প্রচারক ও সংস্কারক এই তিন প্রস্থানের ব্যাখ্যাযোগে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। নবযুগে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় ধর্ম্মপ্রচারের এই প্রণালীই অবলম্বন করিয়াছিলেন। তদীয় শিষ্যানুশিষ্য আমরা তাঁহারই অবলম্বিত প্রণালী অনুবর্ত্তন করিতেছি।

সত্যের প্রমাণ অর্থাৎ জ্ঞানপ্রণালী তিনটী প্রসিদ্ধ,—

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। অন্যান্য প্রমাণ এই তিনেরই

প্রমাণত্রয়

প্রকার-ভেদ মাত্র। পরবর্ত্তী আলোচনায় দৃষ্ট হইবে যে এই তিনের মধ্যেও একান্ত ভেদ নাই, মূলে প্রমাণ একই, ভেদ অবান্তরমাত্র। যাহা হউক্, প্রসিদ্ধ প্রমাণত্রয়ের সংজ্ঞা এই,—বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ অনুভূতির নাম 'প্রত্যক্ষ'। প্রত্যক্ষের সাক্ষ্যকে চিন্তার নিয়মানুসারে পরোক্ষ ব্যাপারে ব্যাপ্ত করার নাম 'অনুমান'। যে স্থলে নিজের প্রত্যক্ষ বা অনুমান যায় না সেস্থলে শ্রদ্ধেয় লোকের কথায় বিশ্বাস করার নাম 'শব্দ'। বৈষয়িক, বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক, সকল বিষয়েই আমরা অল্পাধিক পরিমাণে শব্দ-প্রমাণের উপর নির্ভর করি। শাস্ত্র এক প্রকার শব্দপ্রমাণ। শাস্ত্রকারদের উপর শ্রদ্ধার তারতম্যানুসারে শাস্ত্রের উপর নির্ভরের ন্যূনাধিক্য হয়। সাক্ষাৎ জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই নির্ভর কমিয়া যায়, সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল অবস্থায়ই অল্পাধিক পরিমাণে শাস্ত্র আমাদের সহায়। আধ্যাত্মিক দৃষ্টির প্রস্ফুটনে, বিচারশক্তির উন্মেষণে, প্রেমভক্তির উদ্দীপনে এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবেকের উজ্জ্বলতা-সাধনে শাস্ত্র সকল সময়েই অতীব কার্য্যকর।

দ্বিতীয় অধ্যায়—ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধন

ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ লৌকিক ঈশ্বরবাদ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। লৌকিক ঈশ্বরবাদে তিনটী স্বতন্ত্র বস্তুর মধ্যে ঈশ্বর একটী বস্তুমাত্র। লোকে চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে আত্মা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া মনে করে। জড় ও জীবাত্মাকে ঈশ্বরাধীন বলিয়া মানিলেও ইহাদের ঈশ্বরাধীনতা বুঝিতে ও বুঝাইতে পারে না, সুতরাং প্রকৃত পক্ষে তাহা বিশ্বাসও করে না। উপনিষদের ব্রহ্মবাদ জড় ও জীবাত্মাকে ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র মনে করে না, ঈশ্বরাধীন বলিয়াই মনে করে, এবং ইহাদের ঈশ্বরাধীনত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করে। এই ব্রহ্মবাদে ব্রহ্মই একমাত্র অদ্বিতীয় স্বতন্ত্র বস্তু; রূপরসাদি বিষয় এবং জীবাত্মা তাঁহার অন্তর্গত। বিষয় ও বিষয়ী, জড় ও জীবাত্মা, ইহাদের সহিত পরমাত্মার ভেদ থাকিলেও সেভেদ ব্রহ্মের স্বগত অর্থাৎ নিজের অন্তর্গত ভেদ। জড় ও জীবের মধ্যে যে বিজাতীয় ভেদ এবং জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে যে সজাতীয় ভেদ কল্পিত হয়, উপনিষদের মতে ব্রহ্মের সহিত তাহাদের সেরূপ ভেদ নাই। লৌকিক স্থূল ভেদ অবিদ্যামূলক। জ্ঞানসাধনের বলে ক্রমশঃ সেভেদ তিরোহিত হয়। চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে লোকে আত্মজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র মনে করে। রূপরসাদি বিষয়কে

ব্রহ্মবাদ—লৌকিক ও ঔপনিষদিক

জানিতে গিয়া আমরা যে তৎসঙ্গে আত্মাকে জানি, তাহা মনে করে না। রূপরসাদি বিষয় যে আত্মাধীন এবং আত্মগত হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহা বুঝিতে পারে না, সুতরাং বিষয়কে বিষয়ী হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করে। জীবাত্মার জ্ঞান দেশ-কালে সীমাবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হয়, কিন্তু ঈশ্বর সমুদায় দেশ-কাল জানেন, এই ভাবিয়া লোকে জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে একান্ত ভেদ কল্পনা করে। কিন্তু সীমার জ্ঞানেই যে অসীমত্ব বর্ত্তমান, জীব অসীমের সহিত মূলে এক না হইলে যে তাহার সীমাজ্ঞান হইত না, লৌকিক চিন্তা তাহা বুঝিতে পারে না। ঔপনিষদিক ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনের ইঙ্গিতমাত্র আমরা দিলাম। গভীর ভাবে উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিলে ঈদৃশ ইঙ্গিত উজ্জ্বল জ্ঞানে পরিণত হয়।

কিন্তু উপনিষদ্ কেবল জ্ঞানশাস্ত্র নহে, ইহাতে প্রেম এবং প্রেমানুমোদিত শুদ্ধ জীবনের উপদেশও যথেষ্ট আছে।

ব্রহ্মসাধন

'গীতা', 'ভাগবত' প্রভৃতি সাধনগ্রন্থে এরূপ উপদেশ আরো বিকশিত হইয়াছে। ব্রহ্মবস্তুকে সমাধি-যোগে দর্শন করিলে গভীর প্রেমানন্দের উদয় হয় এবং এই প্রেমানন্দ বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া জীবনকে নির্ম্মল ও মধুর করে। জীবের প্রতি পরভাবই সর্ব্বপ্রকার অপ্রেম ও অপবিত্রতার কারণ। ব্রহ্মযোগে সেই পরভাব দূর হইয়া জীবমাত্রেই আত্মভাব সঞ্চারিত হয় এবং অপ্রেম ও অপবিত্রতা দূরীভূত হয়। ঔপনিষদিক জ্ঞান-সাধনের ন্যায়

আমরা এস্থলে উপনিষদুক্ত প্রেম-পুণ্য সাধনের ও কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র দিলাম, পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে এই আভাস উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করিব।

তৃতীয় অধ্যায়—ঋষিপরিচয়

(১) 'ঈশা'দি দশোপনিষদ্

উপনিষদে অনেক ঋষির নাম পাওয়া যায়। এসকল নাম কত দূর ঐতিহাসিক ব্যক্তির পরিচায়ক, এবং কত দূরই বা কাল্পনিক, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। তাহাতে বিশেষ ক্ষতিও নাই।

দার্শনিক ও ঐতিহাসিক ধর্ম্মের প্রভেদ

উপনিষদের ধর্ম্ম ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে না; ইহার সত্যতার প্রমাণ সাক্ষাৎ জ্ঞান। উপনিষদুক্ত শিক্ষা যিনিই দিয়া থাকুন্, সেই শিক্ষা শিষ্যের অনুভূতি ও বিচারের সহিত মিলিলেই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া গ্রাহ্য; শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের সহিত ইহার অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ নাই। এই অর্থে উপনিষদের ধর্ম্ম চলিত মহাপুরুষীয় ধর্ম্ম-গুলির ন্যায় ঐতিহাসিক ধর্ম্ম নহে; উহা সাক্ষাৎ জ্ঞানমূলক ধর্ম্ম। এমন হইতে পারে যে উপনিষদ্-প্রসিদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য, প্রবাহণ, ইন্দ্র, প্রজাপতি প্রভৃতি ঋষি ঐতিহাসিক পুরুষ নহেন, অথবা ঐতিহাসিক পুরুষ হইলেও তাঁহাদের নামে কথিত উক্তগুলির প্রকৃত বক্তা বা লেখক নহেন; প্রকৃত বক্তা বা লেখকেরা উক্তিগুলির গৌরব বৃদ্ধির জন্য এসকল নাম ব্যবহার করিয়াছেন। ইন্দ্র এবং প্রজাপতি যে ঋগ্বেদের দেবতা, উপনিষদ্ যুগের ঋষি নহেন, তাহা সহজেই বোঝা

যায়। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। উপদেশগুলি নিজের আভ্যন্তরীণ গৌরবেই গৌরবান্বিত; পুরাতন জনশ্রুতি বা সর্ব্বসম্মানিত সাহিত্যের সহিত সম্বন্ধজনিত ধার করা গৌরব এগুলির উপর আরোপ করার কোন প্রয়োজন নাই। যে শাস্ত্র বা সাহিত্য বহু যুগ ধরিয়া লোকের উপকার করিয়াছে এবং তজ্জন্য সম্মান লাভ করিয়াছে, তাহার একটা ঐতিহাসিক গৌরব আছে বই কি? উপনিষদাদি শাস্ত্রের সেগৌরব নিঃসন্দিগ্ধ। কিন্তু সেগৌরব ঐতিহাসিক গবেষণা বা সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে না। উপনিষদ্ বা গীতায় কথিত নাম বা কাহিনীগুলি কল্পিত বা ঐতিহাসিক যাহাই হউক্, এসকল শাস্ত্রের উপদিষ্ট ধর্ম্মের সত্যতা ও মূল্যবত্তার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

যাহা হউক্, এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর আমরা উপনিষদুক্ত প্রধান প্রধান ঋষিদের কিঞ্চিৎ পরিচয়দানে প্রবৃত্ত হই। 'ঈশা' ও 'কেন' উপনিষদে কোন ঋষির নাম নাই। 'কঠ' উপনিষদের প্রধান বক্তা মৃত্যু বা যম। এই যম যে কোন প্রকৃত ঋষি নহেন, মৃত্যু বা মৃত্যুভয়ের রূপকমাত্র, তাহা সহজেই বোঝা যায়। নচিকেতাও কোন ব্যক্তিবিশেষ নহেন, অগ্নি বা অগ্নিসাধ্য ধর্ম্মের ব্যক্তিকরণ মাত্র। 'প্রশ্ন' উপনিষদের ঋষি পিপ্পলাদ। তিনি এই উপনিষদের ছয় অধ্যায়ে ছয় জন শিষ্যকে নানা তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। যথাস্থানে আমরা

পিপ্পলাদ, শ্বেতাশ্বতর, চিত্র প্রভৃতি ঋষি

এসকল তত্ত্বের আলোচনা করিব। 'মুণ্ডক' উপনিষদের ঋষি অঙ্গিরস্ বা অঙ্গিরা। ইনি মন্ত্রযুগের এক জন প্রসিদ্ধ ঋষি। 'মাণ্ডূক্য' উপনিষদে কোন ঋষির নাম নাই, কিন্তু যাঁহার নামে এই উপনিষদ্ অভিহিত, তিনি এক জন প্রসিদ্ধ ঋষি বটেন। 'ঐতরেয়' উপনিষদ্ ইতরানন্দন ঋষি মহীদাসের নামে অভিহিত, ইহার বক্তার নাম নাই। 'শ্বেতাশ্বতর' উপনিষদের বক্তা স্বয়ং শ্বেতাশ্বতর। 'কৌষীতকি' উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের বক্তা রাজর্ষি চিত্র। তিনি নিজ পুরোহিত আরুণিকে ব্রহ্মলোক সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। এই আখ্যায়িকাই পরিবর্ত্তিত আকারে 'ছান্দোগ্য' ও 'বৃহদারণ্যকে' দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়াধ্যায়ের ঋষি কৌষীতকি, পৈঙ্গ্য, শুষ্কভৃঙ্গার ও প্রতর্দ্দন; কিন্তু তাঁহাদের উপদেশ প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত নহে, কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত। তৃতীয়াধ্যায়ের বক্তা ইন্দ্র, শ্রোতা প্রতর্দ্দন। এই অধ্যায়ে উপদিষ্ট গভীর দার্শনিক তত্ত্ব যথাস্থানে আলোচিত হইবে। চতুর্থাধ্যায় কাশীরাজ অজাতশত্রু ও পণ্ডিতাভিমানী ব্রাহ্মণ বালাকির কথোপকথন। বালাকি প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হইয়া রাজর্ষির নিকট উপনয়ন প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাঁহাকে উপনীত না করিয়াই তাঁহার নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেন। এই আখ্যায়িকাই পরিবর্ত্তিত আকারে 'বৃহদারণ্যকে' কথিত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়—ঋষিপরিচয়

(২) 'ছান্দোগ্য' উপনিষদ্

'ছান্দোগ্য' উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম সাত খণ্ডে ব্রহ্মবিষয়ে কোন মূল্যবান্ উপদেশ নাই। অষ্টম ও নবম খণ্ডে আদিকারণ বিষয়ে শালাবত্য শিলক ও দাল্ভ্য চৈকিতায়ন নামক ব্রাহ্মণদ্বয় এবং প্রবাহণ জৈবলি নামক রাজর্ষির কথোপকথন আছে। ব্রাহ্মণদ্বয়ের বিচারে অসন্তুষ্ট হইয়া প্রবাহণ আকাশাত্মা অনন্তস্বরূপ সম্বন্ধে নিজ মত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা অতি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু প্রবাহণের পঞ্চাগ্নি-বিষয়ক মত ছান্দোগ্যের অন্যত্র (৫।৩-১০) বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দশম ও একাদশ খণ্ডে উষস্তি চাক্রায়ণের আখ্যায়িকা আছে। ঋষির উপদেশ প্রধানতঃ যজ্ঞবিষয়ক, কিন্তু আখ্যায়িকাতে তৎকালীন সামাজিক অবস্থার আভাস পাওয়া যায়। দ্বাদশ খণ্ড হইতে তৃতীয়াধ্যায়ের ত্রয়োদশ খণ্ড পর্য্যন্ত ব্রহ্মবিষয়ক কোন মূল্যবান্ উপদেশ নাই, কোন প্রসিদ্ধ ঋষিরও উল্লেখ নাই। তৃতীয়াধ্যায়ের চতুর্দ্দশ খণ্ডে ঋষি শাণ্ডিল্যের নামে একটী 'বিদ্যা' বা 'উপাসনা' আছে। বৈদান্তিক সাহিত্যে ইহার বহুল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সপ্তদশ খণ্ডে আঙ্গিরস-বংশীয় ঘোরনামক ঋষি, তাঁহার উপদিষ্ট

প্রবাহণ, রৈক্ক, অশ্বপতি প্রভৃতি

পুরুষযজ্ঞ এবং তাঁহার শিষ্য দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। চতুর্থাধ্যায়ের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে রাজা জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ও ঋষি রৈক্বের আখ্যায়িকা এবং ঋষিকর্তৃক ব্যাখ্যাত 'সম্বর্গবিদ্যার' উল্লেখ আছে। চতুর্থ হইতে নবম খণ্ড পর্য্যন্ত সত্যকাম জাবালের প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা। এই অংশের ঋষি হারিদ্রুমত, কিন্তু সত্যকামের শিক্ষার অধিকাংশই প্রকৃতিলব্ধ। দশম হইতে পঞ্চদশ খণ্ড পর্য্যন্ত উপকোশল কামলায়নের আখ্যায়িকা। এস্থলে ঋষি সত্যকাম জাবাল, কিন্তু উপকোশলের লব্ধ 'অগ্নিবিদ্যা' অগ্নি হইতে প্রাপ্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। সত্যকাম জাবালের উপদেশ অতি সংক্ষিপ্ত। পঞ্চমাধ্যায়ের তৃতীয় হইতে দশম খণ্ড পর্য্যন্ত রাজর্ষি প্রবাহণের সহিত গৌতমবংশীয় আরুণি ও তৎপুত্র শ্বেতকেতুর কথোপকথন উপলক্ষে 'পঞ্চাগ্নিবিদ্যা' ও দেবযান-পিতৃযান-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে এই কথোপকথনই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে প্রদত্ত হইয়াছে। যথাস্থানে এবিষয়ে আলোচনা করা যাইবে। একাদশ হইতে অষ্টাদশ খণ্ড পর্য্যন্ত অশ্বপতি-ষড়্‌-ব্রাহ্মণ-সংবাদ কথিত হইয়াছে। ইহাতে উদ্দালক আরুণি এবং অপর পাঁচজন ব্রাহ্মণের সহিত কথোপকথন উপলক্ষে কেকয়বংশীয় রাজর্ষি অশ্বপতি বৈশ্বানর-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই অধ্যায়ের শেষাংশস্থিত প্রাণাগ্নিহোত্রে কোন ঋষির নাম নাই।

ছান্দোগ্যের সমগ্র ষষ্ঠাধ্যায়ের ঋষি উদ্দালক আরুণি এবং শ্রোতা তৎপুত্র শ্বেতকেতু। এই অধ্যায়ের আলোচ্য "তৎ ত্বমসি" মহাবাক্য সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব। সমগ্র সপ্তমাধ্যায়ের বক্তা দেবর্ষি সনৎকুমার এবং শ্রোতা দেবর্ষি নারদ। সনৎকুমার বা স্কন্দ দেবসেনাপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। নারদ পরবর্ত্তী পৌরাণিক সাহিত্যে ভক্তির শিক্ষক ও আদর্শরূপে পূজিত। সনৎকুমারের উপদিষ্ট 'ভূমা'-তত্ত্ব বিশেষ আলোচনার যোগ্য। অষ্টমাধ্যায়ের প্রথম ছয় খণ্ডে "দহরবিদ্যা' 'ব্রহ্মলোক' প্রভৃতি নানা আবশ্যকীয় বিষয় থাকিলেও কোন ঋষির নাম নাই। সপ্তম হইতে দ্বাদশ খণ্ড পর্য্যন্ত যে প্রজাপতি ও ইন্দ্রবিরোচন-সংবাদ উক্ত হইয়াছে তাহা অতীব প্রয়োজনীয়। আমাদের প্রণীত তুখানা পুস্তকে ('Theism of the Upanishads' এবং 'Pancharshi') আমরা দেখাইয়াছি যে এই সংবাদ বৃহদারণ্যকের ব্রহ্মলোক-বর্ণনার সমালোচনা। যথাস্থানে এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা হইবে। এই 'সংবাদের' বক্তা প্রজাপতি, শ্রোতৃদ্বয় ইন্দ্র ও বিরোচন। প্রজাপতি ও ইন্দ্র ঋগ্বেদের দেবতা, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিরোচন ঋগ্বেদোক্ত অসুর, প্রহ্লাদের পুত্র। সুতরাং এই 'সংবাদে'র ঐতিহাসিক মূল্য কিছুই নাই, কিন্তু তত্ত্বাংশে ইহা অমূল্য। ছান্দোগ্যের শেষ তিনটী খণ্ডে কতিপয় প্রসিদ্ধ শ্রুতি আছে এবং ব্রহ্মা, প্রজাপতি ও

আরুণি, সনৎকুমার, প্রজাপতি প্রভৃতি

মনু এই তিন জন ঋগ্বেদোক্ত পুরুষকে উপনিষদ্‌বক্তা রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়—ঋষিপরিচয়

(৩) 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদ্

'বৃহদারণ্যক' উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ে বক্তারূপে কোন ঋষির নাম নাই। প্রসঙ্গক্রমে কোন কোন ঋষির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ের প্রথম তিন 'ব্রাহ্মণে' যে সকল উপদেশ আছে তন্মধ্যে তৃতীয় ব্রাহ্মণের পবমান-মন্ত্র, 'অসতো মা সদ্গময়' ইত্যাদি, বিশেষ মূল্যবান্। চতুর্থাধ্যায়ে ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধন বিষয়ে কতিপয় উপাদেয় শ্রুতি আছে, যেগুলি পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি বলিয়া বর্ণিত আছে। সেসকল অধ্যায় আলোচনার সময় আমরা এসকল উক্তির ব্যাখ্যা করিব। এই অধ্যায়ে কতিপয় উচ্চ তত্ত্বের ইঙ্গিত করা হইয়াছে, কিন্তু যে ভাষায় এসকল তত্ত্ব বলা হইয়াছে তাহা কবিত্বের ভাষা, দর্শনের ভাষা নহে; এই জন্য আমরা এস্থলে সেসকল তত্ত্ব আলোচনা করিলাম না। এসকল কবিত্বপূর্ণ বর্ণনায় পরবর্ত্তী পৌরাণিক আখ্যায়িকার বীজ দেখিতে পাওয়া যায়।

কবিত্বের ভাষায় দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা

দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণের ঋষি কাশীরাজ অজাতশত্রু ও 'দৃপ্ত' ব্রাহ্মণ বালাকি। বালাকির অসম্যক্ ব্রহ্মবাদ ব্যাখ্যায় অসন্তুষ্ট হইয়া রাজর্ষি তাঁহাকে সম্যক্

ব্রহ্মবাদ শিক্ষা দিয়াছেন। পাঠক ইতিপূর্ব্বে কৌষীতকির বর্ণনায় এই আখ্যায়িকার পরিচয় পাইয়াছেন। দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্রাহ্মণে কোন ঋষির নাম নাই, বিশেষ মূল্যবান্ কোন উপদেশও নাই। দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণ ও চতুর্থাধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণ অনেকাংশে একরূপ। এই দুই ব্রাহ্মণের নাম 'মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ'। উভয়েই ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তৎপত্নী মৈত্রেয়ীকে আত্মতত্ত্ব ও অমৃতত্বের উপদেশ দিয়াছেন। বৈদান্তিক সাহিত্যে এই উপদেশের স্থান অতি উচ্চ। আমরা যথাস্থানে ইহার ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিব। দ্বিতীয়াধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণের নাম 'মধু ব্রাহ্মণ'। ইহাতে জগৎ, জীব ও ব্রহ্মের মৌলিক একত্ব শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে কোন ঋষির নাম নাই। ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে আচার্য্য-শিষ্য-পরম্পরায় অনেক ঋষির উল্লেখ করা হইয়াছে, কোন উপদেশ দেওয়া হয় নাই। ঈদৃশ ব্রাহ্মণকে 'বংশ-ব্রাহ্মণ' বলে।

যাজ্ঞবল্ক্য ও অজাতশত্রু

সমগ্র তৃতীয়াধ্যায় অতীব উপাদেয়, ইহাতে রাজর্ষি জনকের যজ্ঞসভার বর্ণনা আছে। অশ্বল, আর্ত্তভাগ, ভুজ্যু, উষস্ত, কহোল, গার্গী, উদ্দালক এবং শাকল্য, এই আটজন প্রশ্নকর্ত্তা যজ্ঞ, দেবতা এবং ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্য সেসকল প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। এসকল উত্তর

জনকযজ্ঞে ঋষিসঙ্ঘ

নয়টী 'ব্রাহ্মণে' সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমরা যথাস্থানে কোন কোন 'ব্রাহ্মণে'র আলোচনা করিব।

চতুর্থ অধ্যায়, বিশেষতঃ ইহার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ব্রাহ্মণ, অতীব উপাদেয়। প্রথম ব্রাহ্মণে জনকের নিকট ছয় জন আচার্য্যের মত শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাদের মতের অসম্পূর্ণতা দেখাইয়াছেন।

জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য আত্মার স্বরূপ এবং জীবাত্মার উৎক্রমণ, পুনর্জ্জন্ম ও মোক্ষ সম্বন্ধে নিজমত জনকের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈদান্তিক সাহিত্যে এই ব্যাখ্যার স্থান অতি উচ্চ। যথাস্থানে আমরা ইহার আলোচনা করিব। পঞ্চম ব্রাহ্মণে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ পুনরুক্ত হইয়াছে। পঞ্চমাধ্যায় খিল-কাণ্ড অর্থাৎ পরিশিষ্ট। ইহাতে কোন নূতন বিষয় নাই, পূর্ব্বোক্ত কোন কোন বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পুনরুক্তি করা হইয়াছে। ষষ্ঠাধ্যায়ও অনেকাংশে তদনুরূপ। ইহার বিশেষত্ব এই যে ইহার একটী ব্রাহ্মণে নানাবিধ ক্রিয়ার বিধান আছে। ইহার দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে ছান্দোগ্যের পঞ্চমাধ্যায়োক্ত আরুণি-প্রবাহণ-সংবাদ পরিবর্ত্তিত ভাষায় এবং কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে পুনরুক্ত হইয়াছে।

পাঠক দেখিবেন যে আমরা যে সকল ঔপনিষদ্ ঋষির পরিচয় দিলাম তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ঋষি দ্বাদশ জন, —উদ্দালক আরুণি,* যাজ্ঞবল্ক্য, প্রজাপতি, ইন্দ্র, চিত্র,

সনৎকুমার, অজাতশত্রু, প্রবাহণ, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, পিপ্পলাদ ও শ্বেতাশ্বতর। ঔপনিষদ্ ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় আমরা বিশেষভাবে প্রথমোক্ত ছয় জনের এবং সাধারণ ভাবে অপর ছয় জনের সাহায্য গ্রহণ করিব।

দ্বাদশ মহর্ষি

ষষ্ঠ অধ্যায়

আত্মা ও অনাত্মা

পাঠক ইতিমধ্যেই দেখিয়া থাকিবেন যে উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদ মূলে আত্মবাদ। ইহা লৌকিক দ্বৈতবাদ অর্থাৎ আত্মাছাড়া অন্য বস্তুও আছে, এই মত স্বীকার করে না। রূপরসাদি যে সকল গুণকে লোকে অনাত্মবস্তুর গুণ বলিয়া মনে করে, উপনিষদ্ সেসকলকে আত্মাশ্রিত মনে করেন এবং সসীম আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও উহাকে অসীমের অন্তর্গত বলিয়া শিক্ষা দেন। আমরা এখন এই আত্মবাদের প্রমাণ ও ব্যাখ্যার আলোচনা করিব। প্রথমতঃ 'আত্মা' বলিতে ঋষিরা কি বুঝেন তাহাই দেখাইব। এবিষয়ে 'ঐতরেয়' উপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়োক্ত সংজ্ঞাই সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট। ঋষি বা কোন প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"কোঽয়-মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে? কতরঃ স আত্মা?"—"আত্মা-রূপে আমরা কাহার উপাসনা করি? [বহু ইন্দ্রিয় বা শক্তির মধ্যে] কোনটী আত্মা?" তার পরে যাহা আছে তাহাও প্রশ্ন বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহা উত্তরের অংশ ও হইতে পারে। "যেন বা রূপং পশ্যতি যেন বা শব্দং শৃণোতি যেন বা গন্ধানাজিঘ্রতি যেন বা বাচং

আত্মার সংজ্ঞা

ব্যাকরোতি যেন বা স্বাদুচাস্বাদু চ বিজানাতি।”—“যদ্দ্বারা লোকে রূপ দেখে, যদ্দ্বারা শব্দ শুনে, যদ্দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে, যদ্দ্বারা বাক্য উচ্চারণ করে, যদ্দ্বারা স্বাদু অস্বাদু জানে (তাহাই আত্মা)। ‘যেন’ এই তৃতীয়া বিভক্ত্যন্ত শব্দ ব্যবহার করাতে বোধ হইতে পারে ঋষি এস্থলে চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের কথা বলিতেছেন এবং সেসকল ইন্দ্রিয় আত্মা নহে এই ইঙ্গিত করিতেছেন। কিন্তু ‘ইন্দ্রিয়’ শব্দটী দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থ চক্ষুকর্ণাদির বাহ্যরূপ,—দেশে বিস্তৃত আকার,—আর এক অর্থ দর্শন-শ্রবণাদি শক্তি ও সেসকল শক্তির আধাররূপী আত্মা। ‘ইন্দ্রিয়ে’র শেষোক্ত অর্থটী গ্রহণ করিলে ‘যেন’ শব্দটী আত্মাকেই বুঝাইতেছে, এবং সমগ্র বাক্যটীর অর্থ এই দাঁড়াইতেছে—‘যেন’ অর্থাৎ যাঁহার সাহায্যে, যিনি থাকাতে, লোকে দেখে, শুনে, বলে, আস্বাদন করে, তিনিই আত্মা। ‘যেন’ শব্দের এই প্রয়োগ উপনিষদের অন্যত্রও দেখা যায়, যেমন ‘কেন’ উপনিষদের চতুর্থ হইতে অষ্টম শ্রুতিতে। যাহা হউক্, পরের বাক্যটীর অর্থ আরো স্পষ্ট,—“যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ সঞ্জ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টি র্ধৃতি র্মতির্মনীষা জুতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি। সর্ব্বাণ্যেতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি।”—“এই যে হৃদয়, এই যে মন, সংজ্ঞা অর্থাৎ চেতনভাব, আজ্ঞান (অর্থাৎ কর্তৃভাব), বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা, দৃষ্টি, ধৃতি, মতি, মনীষা,

জুতি (অর্থাৎ তৎপরতা) স্মৃতি, সঙ্কল্প (অর্থাৎ সম্যক্ অবধারণা, ক্রতু (অধ্যবসায়) অসু (অর্থাৎ প্রাণনাদি), কাম (অর্থাৎ বিষয়াকাঙ্ক্ষা), বশ (অর্থাৎ অভিলাষ), এই সমুদয়ই প্রজ্ঞানের নামমাত্র।" ঋষি-প্রদত্ত আত্মার সংজ্ঞা অতি ব্যাপক। আধুনিক ভাষায় জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা, এই তিন শব্দে যাহা কিছু বুঝায়, সমস্তই আত্মার স্বরূপ। তাঁহার প্রদত্ত আত্মার নামগুলির মধ্যে 'প্রজ্ঞান' নামের প্রাধান্য সহজেই বোঝা যায়। আত্মার সমস্ত ক্রিয়াই জ্ঞান-সাপেক্ষ, জ্ঞান ছাড়া ভাব ও ইচ্ছা অসম্ভব। প্রজ্ঞানই যে ব্রহ্ম এবং জগতের সমস্ত বস্তুই যে প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তাহা ঋষি পরবর্ত্তী শ্রুতিতে বলিয়াছেন, কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত প্রমাণ-সাপেক্ষ। আমরা ক্রমশঃ সেই প্রমাণ উপস্থিত করিব।

বৃহদারণ্যকের 'মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে'র সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাঠক ইতিমধ্যেই পাইয়াছেন। ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার পত্নীদ্বয় মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীর মধ্যে নিজ সম্পত্তি বিভাগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। মৈত্রেয়ী ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন বিত্তপূর্ণা পৃথিবী লাভ করিলে তিনি অমর হইতে পারিবেন কিনা। ঋষি বলিলেন বিত্তদ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশা নাই। মৈত্রেয়ী বলিলেন যাহা লইয়া তিনি অমর হইতে পারিবেন না তাহা তিনি চান

জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য

না, তিনি অমৃতত্ব-বিষয়ক উপদেশ চান। ঋষি বলিলেন যে মৈত্রেয়ী তো তাঁহার প্রিয়াই, কিন্তু উপরি-উক্ত বাক্য বলাতে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার প্রিয়তরা হইলেন। এই বলিয়া ঋষি তাহার প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এই তত্ত্ব আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব। আত্মার জন্যই সকল বস্তু প্রিয় হয় এবং আত্মজ্ঞানই অমৃতত্বের সাধন, সুতরাং ঋষি আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। লোকে আত্মাকে শরীরে আবদ্ধ একটী ক্ষুদ্র বস্তু বলিয়া মনে করে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আত্মা অতি বৃহৎ বস্তু। আমরা যে সকল বস্তুকে আত্মাতিরিক্ত মনে করি সেসকল বস্তু আত্মারই অন্তর্গত। স্বরূপতঃ সকল বস্তুই আত্মা, ভিন্ন ভিন্ন আত্মা নহে, এক অনন্ত আত্মার অংশ বা অনুপ্রকাশ। ঋষি বলিতেছেন, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি। আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্"—"অয়ি মৈত্রেয়ি, আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে, নিদিধ্যাসন (অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে ধ্যান) করিতে হইবে। অয়ি মৈত্রেয়ি, আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন, ও বিজ্ঞান দ্বারা এই সমুদয় অবগত হওয়া যায়।" আচার্য্য শঙ্কর এস্থলের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—আত্মার দর্শনই উদ্দেশ্য বা সিদ্ধি, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সেই উদ্দেশ্যের উপায়, সেই সিদ্ধির সাধন। এই ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য

না করিয়াও আমরা বলিতে পারি যে ইহা কিছু ঘুরান ব্যাখ্যা। আচার্য্য ঘুরান ব্যাখ্যা কেন দিলেন তাহা আমরা এখন বলিলাম না, পাঠক তাহা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবেন। ঔপনিষদ্ ব্রহ্মবাদের যে আভাস পাঠক ইতিমধ্যেই পাইয়াছেন তাহার অনুযায়ী সোজা ব্যাখ্যা এই যে আত্মাকে দেখিতে হইবে, চক্ষুদ্বারাই দেখিতে হইবে; শুনিতে হইবে, কর্ণদ্বারাই তাঁহার বাণী শুনিতে হইবে; মনন করিতে হইবে, অর্থাৎ মনের দ্বারাই চিন্তা করিতে হইবে, নিশ্চিতরূপে ধ্যান করিতে হইবে, ধ্যানদ্বারা ধরিতে হইবে। ফলতঃ আত্মা-ছাড়া দেখিবার, শুনিবার, মনন ও ধ্যান করিবার বস্তু তো নাই; আমরা আত্মাকেই দেখি, আত্মাকেই শুনি, আত্মাকেই মনন ও ধ্যান করি, কিন্তু অজ্ঞানতাবশতঃ কল্পনা করি যে অনাত্ম বস্তুকে দেখিতেছি, শুনিতেছি, মনন ও ধ্যান করিতেছি। অজ্ঞানতা দূর হইলেই বোঝা যায় যে দর্শন শ্রবণাদি সর্ব্ব প্রকার জ্ঞানক্রিয়ার একমাত্র বিষয় আত্মা। এবিষয়ে আলোচ্য ব্রাহ্মণেই খুব স্পষ্ট কথা আছে। ঋষি বলিতেছেন যে কোনও বস্তুকে যদি কেহ আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে তবে সেবস্তু তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। 'তাহাকে পরিত্যাগ করিবে' অর্থ তাহার নিকট নিজস্বরূপ প্রকাশ করিবে না। ঋষির বাক্য এই,—"ব্রহ্ম তং পরাদাদ্ যোঽন্য-ত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ। ক্ষত্রং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ। লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ।

দেবাস্তং পরাত্নুর্যোঽন্যত্রাত্মনো দেবান্ বেদ। ভূতানি তং পরাত্নুর্যোঽন্যত্রাত্মনো ভূতানি বেদ। সর্ব্বং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ। ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রং ইমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা"।—অর্থাৎ "যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণজাতিকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে ব্রাহ্মণ জাতি তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয় জাতিকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, ক্ষত্রিয় জাতি তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি (পৃথিব্যাদি) লোকসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, লোকসমূহ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি দেবগণকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে দেবগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন। যে ব্যক্তি ভূতসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, ভূতসমূহ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি সমুদয় বস্তুকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, সমুদয় বস্তু তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। এই ব্রাহ্মণ জাতি, এই ক্ষত্রিয় জাতি, এই লোকসমূহ, এই ভূতসমূহ, এই সমুদয় বস্তু, (এই সমস্তই তাহা) যাহা এই আত্মা"। পাঠক হয় ত ভাবিতেছেন এ সকল অদ্ভুত উক্তির প্রমাণ কোথায়? প্রমাণের দিকেই আমরা যাইতেছি। প্রমাণের আভাস নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে আছে,—"স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুযাদ্ গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ। স যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন

বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুযাদ্ গ্রহণায় বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ।” অর্থাৎ “যেমন তাড্যমান দুন্দুভি হইতে বিনির্গত শব্দসমূহকে গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু দুন্দুভি গ্রহণ করিলে কিম্বা দুন্দুভিবাদককে গ্রহণ করিলে ঐ শব্দ গৃহীত হয়; যেমন বাদ্যমান্ শঙ্খ হইতে বিনির্গত শব্দসমূহকে গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু শঙ্খ গ্রহণ করিলে কিম্বা শঙ্খবাদককে গ্রহণ করিলেই ঐ শব্দ গৃহীত হয়; যেমন বাদ্যমান বীণা হইতে বিনির্গত শব্দসমূহকে গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু বীণা গ্রহণ করিলে কিম্বা বীণাবাদককে গ্রহণ করিলেই ঐ শব্দ গৃহীত হয়”—তেমনই (ঋষির অভিপ্রায় এই) আত্মার দৃষ্ট, শ্রুত, মত ও ধ্যাত বস্তু আত্মা হইতে পৃথক্‌রূপে জানা যায় না, ভাবাও যায় না, এসমস্ত আত্মা হইতে পৃথক্ হইয়া আছে এই কথার কোন অর্থই হয় না। বিষয়-বিষয়ী পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ ভাবেই প্রকাশিত হয়। ইহাদিগকে ভাবিতে হইলে, ইহাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হইলে, ইহাদিগকে সম্বদ্ধ ভাবেই ভাবিতে ও বিশ্বাস করিতে হয়। চিন্তা ও বিশ্বাসের মৌলিক নিয়ম এই। লোকে চিন্তার এই মৌলিক নিয়ম না বুঝিয়া বিষয়শূন্য বিষয়ী এবং বিষয়িশূন্য বিষয় সম্বন্ধে যে চিন্তা করে সে চিন্তা ছিন্নসত্তা (abstract) কল্পনামাত্র, এবং যে সকল কথা বলে সেসকল কথা স্ববিরোধী (self-contradictory)। উপনিষদের ঋষিদের মধ্যে এই সত্যটী যিনি সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিতরূপে বুঝিয়া-

ছিলেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি 'কৌষীতকি'র তৃতীয়াধ্যায়ের ইন্দ্র। তাঁহার উপদেশের শেষ ভাগ আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত। বক্তারং বিদ্যাৎ। ন গন্ধং বিজিজ্ঞাসীত। ঘ্রাতারং বিদ্যাৎ। ন রূপং বিজিজ্ঞাসীত। রূপবিদং বিদ্যাৎ। ন শব্দং বিজিজ্ঞাসীত। শ্রোতারং বিদ্যাৎ। নান্নরসং বিজিজ্ঞাসীত। অন্নরসস্য বিজ্ঞাতারং বিদ্যাৎ। ন কর্ম্ম বিজিজ্ঞাসীত। কর্ত্তারং বিদ্যাৎ। ন সুখদুঃখে বিজিজ্ঞাসীত। সুখদুঃখয়ো বিজ্ঞাতারং বিদ্যাৎ। নানন্দং ন রতিং ন প্রজাতিং বিজিজ্ঞাসীত। আনন্দস্য রতেঃ প্রজাতে র্বিজ্ঞাতারং বিদ্যাৎ। নেত্যাং বিজিজ্ঞাসীত। এতারং বিদ্যাৎ। ন মনো বিজিজ্ঞাসীত। মন্তারং বিদ্যাৎ। তা বা এতা দশৈব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞং দশ প্রজ্ঞামাত্রা অধিভূতং। যদ্ধি ভূতমাত্রা ন স্যুর্ণ প্রজ্ঞামাত্রাঃ স্যুঃ। যদ্বা প্রজ্ঞামাত্রা ন স্যুর্ণ ভূতমাত্রাঃ স্যুঃ। নহ্যন্যতরতো রূপং কিঞ্চন সিধ্যেৎ। নো এতন্নানা। তদ্‌যথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতা নাভাবরা অর্পিতা এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাসু অর্পিতাঃ। স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ।...এষ লোকপালঃ। এষ লোকাধিপতিঃ। এষ সর্ব্বেশঃ। স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ।"—অর্থাৎ "বাক্‌কে জানিতে চেষ্টা করিবে না (কারণ বক্তাছাড়া বাক্ ছিন্নসত্তা কল্পনামাত্র, গোটা জ্ঞেয় বস্তু নহে।) বক্তাকে জানিতে চেষ্টা

করিবে। গন্ধকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, আঘ্রাতাকে জানিতে চেষ্টা করিবে। রূপকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, রূপবিদ্‌কে জানিতে চেষ্টা করিবে। শব্দকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, শ্রোতাকে জানিতে চেষ্টা করিবে। অন্নরসকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, অন্নরসের বিজ্ঞাতাকে জানিতে চেষ্টা করিবে। সুখ-দুঃখকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, সুখ-দুঃখের বিজ্ঞাতাকে জানিতে চেষ্টা করিবে। আনন্দ, রতি বা প্রজাতিকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, আনন্দ রতি ও প্রজাতির বিজ্ঞাতাকে জানিতে চেষ্টা করিবে। গতিকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, গন্তাকে জানিতে চেষ্টা করিবে। মনকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, মন্তাকে জানিতে চেষ্টা করিবে। এই দশ ভূতমাত্রা (অর্থাৎ বিষয়-জগতের উপাদান) প্রজ্ঞা-প্রতিষ্ঠিত, এবং এই দশ প্রজ্ঞামাত্রা (অর্থাৎ বিষয়ি-জগতের উপাদান) ভূতাধিষ্ঠিত। যদি ভূতমাত্রা না থাকিত তবে প্রজ্ঞামাত্রা থাকিতে পারিত না। যদি প্রজ্ঞামাত্রা না থাকিত তবে ভূতমাত্রা থাকিতে পারিত না। এই দুয়ের কেবল একটীতে কোনও রূপ বা বস্তু সম্ভব নহে। অথচ ইহা (অর্থাৎ প্রকৃত বস্তু) নানা নহে (একমাত্র)। যেমন রথের নেমি অরসমূহে স্থাপিত, এবং অরসমূহ নাভিতে স্থাপিত, তেমনি এই সকল ভূতমাত্রা প্রজ্ঞামাত্রাসমূহে স্থাপিত, এবং প্রজ্ঞামাত্রা-সমূহ প্রাণে স্থাপিত। এই প্রাণই আনন্দময়, অজর ও অমর প্রজ্ঞাত্মা।...ইনি লোকপাল, ইনি লোকাধিপতি। ইনি

সর্ব্বেশ। 'তিনি আমার আত্মা' তাঁহাকে এই রূপে জানিবে।" ইন্দ্রের উক্তির মর্ম্ম এই যে রূপ, রস প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় এবং গতি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়, এসকলকে জ্ঞাতা ও কর্ত্তা হইতে পৃথক্ করিয়া জানা যায় না, ভাবা যায় না, সুতরাং এগুলি প্রকৃত বস্তু নহে। যাহাকে জানা যায়, ভাবা যায়, সে জ্ঞাতা ও কর্ত্তা। সুতরাং সেই গোটা (concrete) বস্তু। কিন্তু জ্ঞাতা ও কর্ত্তাকে জানিতে ভাবিতে গিয়াও আমরা অবশ্যম্ভাবী রূপেই জ্ঞেয় ও কার্য্যকে জানি ও ভাবি। সুতরাং জ্ঞান ও চিন্তার এই দুই দিকের মধ্যে ভেদ আছে বটে, কিন্তু সেই ভেদ একান্ত ভেদ নহে, সেই ভেদের মধ্যে ভেদের অবিরোধী অভেদও আছে। ঋষি ভূতমাত্রা বলিতে বুঝেন 'যাহা আছে'। কিন্তু তিনি জানেন যে কেবল 'আছে' বলিলে বস্তুর সমগ্র স্বরূপ বলা হইল না, 'আছে'র সঙ্গে বলিতে হয় 'জানা হইয়া আছে, 'জ্ঞানের বিষয় হইয়া আছে'। বস্তুর এদিকটাকেই ঋষি প্রজ্ঞামাত্রা বলিয়াছেন। এই যে বিষয়-বিষয়ি-সমন্বিত অখণ্ড বস্তু, তিনিই জীবাত্মা, তিনিই বিশ্বাত্মা, তিনিই বিশ্ব। জীব ও জগৎ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এসকল ভেদ যে মিথ্যা তাহা নহে, কিন্তু ভেদগুলি অভেদের অবিরোধী, অভেদের অন্তর্গত। এগুলি ব্রহ্মের স্বগত ভেদ। সসীম ও অসীমকে আপাততঃ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়; মনে হয় এদুয়ের একটাই সত্য, অন্যটা মিথ্যা। লৌকিক

চিন্তায় সসীমই সত্য, অসীম মিথ্যা বা সন্দিগ্ধ। মায়াবাদীর চিন্তায় অসীমই সত্য, সসীম মিথ্যা। উপনিষদের ভূমাতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় সসীম হইতে ছিন্ন অসীম মিথ্যা বা সন্দিগ্ধ বটেন, কিন্তু সসীমবিশিষ্ট, সসীমের আশ্রয়-রূপী, অসীম কেবল যে সত্য তাহা নহে, একমাত্র সত্য। তেমনি অসীম হইতে ছিন্ন সসীম মিথ্যা বটে, কিন্তু অসীমের আশ্রিত সসীম মিথ্যা হওয়া দূরে থাক্, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে অসীমও ছিন্নসত্তা কল্পনামাত্র হইয়া যায়। আমরা পরের অধ্যায়ে দেবর্ষি সনৎকুমারের ভূমাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া এসকল সত্য আরো স্পষ্টরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

সপ্তম অধ্যায়

সসীম ও অসীম

জ্ঞানের বিশ্লেষ ও সংশ্লেষ

আশা করি পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন যে ঔপনিষদ্ ঋষিদের মতে দর্শন শ্রবণাদি প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়ায় যে বস্তুটী প্রকাশিত হয় সেটী একটী বিবিধ বিজ্ঞান(sensation)-সমন্বিত আত্মা,—যাহাকে আমরা নিজ আত্মা বলি সেই আত্মাই; কিন্তু ক্রমশঃ বোঝা যাইবে যে সেই আত্মাতে সসীম অসীম এই দুটী স্তর আছে। বিজ্ঞানগুলিকে আধাররূপী বিজ্ঞাতা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া ভ্রম হইলেই সেগুলিকে একটা অনাত্ম জড়-জগতের অংশ বলিয়া মনে হয়, আর প্রত্যেক বিজ্ঞাতাকে দেশকালে আবদ্ধ স্বতন্ত্র মনে করিলেই পরমাত্ম-জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে, তাহারা যে এক অসীম আত্মার আশ্রিত, তাহা বোঝা যায় না। ঋষিগণ জ্ঞানের বিশ্লেষণ-রূপ যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া জ্ঞানের সংশ্লেষ দেখিয়াছিলেন,—জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন, পূর্ব্বসংস্কার-নিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীন ভাবে সেই প্রণালী অবলম্বন করিলে আমরা প্রত্যেকেই সেই তত্ত্বে উপনীত হইতে পারি। জ্ঞানক্রিয়াতে যে আত্মা বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান লইয়া আমাদের আত্মারূপে প্রকাশিত হয়, তাঁহাকে

আপাততঃ কেবল একটী সসীম আত্মা, বিশেষ দেশে ও কালে আবদ্ধ আত্মা, বলিয়া বোধ হয়। এই সসীমত্ব মিথ্যা নহে, বাস্তব জগতে সসীমত্বের একটা স্থান আছে। কিন্তু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে সসীম একাকী নহে, তাহার সঙ্গে অসীম নিত্য বর্ত্তমান। দেশ-কাল মিথ্যা নহে; ইহারা যে সসীমত্ব আনয়ন করে তাহাও মিথ্যা নহে। কিন্তু দেশ-কাল এবং দেশ-কালের সীমায় যে বিজ্ঞান-সমন্বিত আত্মা প্রকাশিত হয় তাহাকে পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে তাহার নিত্য আশ্রয় অসীম। বেশী দূর যাইতে হইবে না, আমাদের সম্মুখস্থ বইখানার জ্ঞান বিশ্লেষণ করিলেই আমরা এই সত্যের দর্শন পাইব। এই বইখানা যে আমি দেখিতেছি ও ছুঁইতেছি, এই দেখা ও ছোঁওয়া তো মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শেষ হইয়া যাইতেছে। চক্ষু বুজাইলেই দেখা শেষ, বই হইতে হাত তুলিলেই ছোঁওয়া শেষ। কিন্তু দেখা ছোঁওয়া শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বই তো শেষ হয় না। ক্ষণিক দেখাও ছোঁওয়ারূপ কার্য্য স্থায়ী বস্তুর পরিচয় দিয়া যায়। দেখা ছোঁওয়া শেষ হইয়া যায়; কিন্তু এসকল ঘটনা যে বিজ্ঞান-সমন্বিত আত্মার ক্ষণিক প্রকাশ, সেই আত্মা ক্ষণিক নহে। তাহা যে ক্ষণিক নহে, তাহার বিষয়িত্ব ও বিষয়ত্ব দুইই যে স্থায়ী, তার পরিচয় আমরা সহজেই পাই। চক্ষু মেলিয়া আবার দেখি সেই বর্ণযুক্ত বই রহিয়াছে, আবার ছুঁইয়া জানি সেই শীতলতা ও মসৃণতাযুক্ত বই রহিয়াছে। আমার আগেকার

দেখা ও ছোঁওয়া বইই রহিয়াছে, এই জানাতে যে দ্রষ্টা ও স্প্রষ্টার একত্ব ও স্থায়িত্ব বুঝায় তাহা পাঠক অবশ্য বুঝিতেছেন। এই একত্ব ও স্থায়িত্ব কতটা, তাহা ভাল করিয়া বোঝা আবশ্যক। আগেকার দেখা-ছোঁওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু যাহা শেষ হইয়া যায় তাহা আবার আসে কিরূপে? তাহা আবার আসিয়া পরের দেখা-ছোঁয়ার সঙ্গে মিলিত না হইলে, 'এই সেই আগেকার দেখা ও ছোঁওয়া বস্তু' এই ধারণা সম্ভব হয় না। পাঠক বলিবেন আগেকার দেখা ও ছোঁওয়া শেষ হইলেও তার স্মৃতি থাকে এবং সেই স্মৃতিই পরের দেখা-ছোঁওয়ার সঙ্গে মিলিত হইয়া বস্তুর একত্বের পরিচয় দেয়। কিন্তু স্মৃতি তো সকল সময় থাকে না। একবারের দেখা-ছোঁওয়া বন্ধ করিয়া অন্য বিষয়ে মন দিলে সেই দেখা-ছোঁওয়ার স্মৃতি লুপ্ত হইয়া যায়। সেই স্মৃতি আবার আসে বা আসিতে পারে, সন্দেহ নাই, কিন্তু লুপ্ত স্মৃতির পুনরুদয়ের মধ্যে একটী রহস্য আছে, চিন্তাবিহীন লোকে সে রহস্য দেখে না। পাঠক সে রহস্য দেখুন্ ও বুঝিতে চেষ্টা করুন্। সাক্ষাৎ জ্ঞান,—দেখা, ছোঁওয়া প্রভৃতি,—যেমন জ্ঞাতৃসাপেক্ষ, জ্ঞাতা না থাকিলে জ্ঞান হয় না, স্মৃতিরূপ জ্ঞানও তেমনি স্মর্তৃসাপেক্ষ, স্মর্ত্তা না থাকিলে তাহা থাকিতে পারে না। যখন আমরা কিছু ভুলিয়া যাই, আমাদের মন হইতে, অর্থাৎ জ্ঞান হইতে, তাহা চলিয়া যায়, তখন তো ইহা নষ্ট হইয়া যাইবারই কথা, কারণ

জ্ঞানের বিষয় কেবল জ্ঞেয় হইয়াই থাকিতে পারে, অজ্ঞেয় হইয়া থাকার কোন অর্থই নাই, অজ্ঞেয় হইয়া আছে বলিলে স্ববিরোধী কথা বলা হয়। কিন্তু ভোলা বিষয়ও তো আবার মনে আসে, আসে বলিয়াই জীবন সম্ভব হয়। এবং যখন আসে তখন আগেকার রূপেই আসে, সেরূপে না আসিলে তাকে আগেকার বলিয়া চেনাই যাইত না। আগেকার জ্ঞান ফিরিয়া আসে জ্ঞাতার ছাপ লইয়া,—তাহার আত্মজ্ঞান লইয়া। সাক্ষাৎ জ্ঞানের সময় যেমন জ্ঞানের আকার ছিল,—'আমি ইহা জানিতেছি', স্মৃতির উদয়েও তেমনি ইহার আকার—'আমি ইহা জানিয়াছিলাম'। কালের ভেদ হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞানের ভেদ হয় নাই, আত্মজ্ঞান এবং বিষয়জ্ঞান দুইই অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। ইহাতে নিসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হইতেছে যে আমার ভোলা এবং স্মরণ করার মধ্য সময়ে জ্ঞেয় বস্তুটী নষ্ট হয় নাই, অক্ষুণ্ণ ছিল, এবং জ্ঞানেই ছিল, এমন কি এক অর্থে আমার জ্ঞানেই ছিল। এই রহস্য ভেদ কিরূপে করা যায়? ভোলা অর্থই জ্ঞানে না থাকা, আর স্মরণ হওয়াতেই বোঝা যাইতেছে যে স্মৃত বিষয় বরাবর জ্ঞানে ছিল, জ্ঞানের ভূমি ছাড়ে নাই। এখানে যেন স্ববিরোধিতা আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ এই স্ববিরোধিতা আপাত, প্রকৃত নহে। আত্মার মূল প্রকৃতি না বুঝাতেই এই আপাত স্ববিরোধিতা আসে। লোকে 'আত্মা' অর্থ বুঝে সসীম স্বতন্ত্র আত্মা, যাহা অজ্ঞান হইতে

জ্ঞানে যায়, আবার জ্ঞান হইতে অজ্ঞানে যায়; যাহা জানা বিষয় ভুলিয়া যায়, আবার স্মরণ করে। কিন্তু এই স্মৃতি-বিস্মৃতি ব্যাপারে, এই ভোলা ও মনে করার কার্য্যে, আমরা দেখিতেছি আত্মা সম্বন্ধে লৌকিক ধারণা ভুল। দেখিতেছি এই আত্মার ভিতরে দুটা স্তর আছে। একটা স্তরে ভোলা আছে, আবার মনে করাও আছে, কিন্তু আর একটা স্তরে ভোলা নাই; সেখানে ভোলা থাকিলে স্মৃতি,—আবার মনে আসা,—ব্যাপারটা সম্ভবই হইত না। এই যে আত্মার দুটী স্তরের কথা আমরা বলিলাম, এই দুটী স্তরের চলিত নাম জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মা ভুলে, আবার স্মরণ করে; পরমাত্মা ভুলেন না। এই দুজন যে বিযুক্ত নহেন, একান্ত ভিন্ন নহেন, তাহা ইতিমধ্যেই পাঠক কতকটা দেখিয়াছেন, পরে আরও ভালরূপে দেখিবেন। আবার, তাঁহারা একান্ত অভিন্নও নহেন। যদি এক অভিন্ন পরমাত্মাই থাকিতেন, তাঁহা হইতে ভিন্ন জীবাত্মা না থাকিত, তবে ভোলা ব্যাপারটা একেবারেই অসম্ভব হইত। যাহা হউক্, ভোলার চূড়ান্ত হইতেছে—সুষুপ্তি, স্বপ্নহীন নিদ্রা, যে সময়ে জীব সমস্তই ভুলে। কিন্তু সে আবার জাগে,—ক্রমশঃ তার ভোলা বস্তু সমস্ত স্মরণ হয়। ইহা সম্ভব হইত না যদি তাহার মধ্যে অনিদ্র পরমাত্মা না থাকিতেন। তিনি অনিদ্র বলিয়াই জীবের নিদ্রা ভঙ্গ হয়, জীব জাগ্রত হয়। আমরা যাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি ঋষি পিপ্পলাদ

সংক্ষেপে তাহাই বলিয়াছেন,—"স যদা তেজসাঽভিভূতো ভবতি অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নান্ ন পশ্যত্যথ তদৈতস্মিঞ্ছরীরে এতৎ সুখং ভবতি। স যথা সৌম্য বয়াংসি বাসো বৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে। পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চাপশ্চাপোমাত্রা চ তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চাকাশশ্চাকাশমাত্রা চ চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ শ্রোত্রঞ্চ শ্রোতব্যঞ্চ ঘ্রাণঞ্চ ঘ্রাতব্যঞ্চ রসশ্চ রসয়িতব্যঞ্চ ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যঞ্চ বাক্ চ বক্তব্যঞ্চ হস্তৌ চাদাতব্যঞ্চোপস্থাশ্চানন্দয়িতব্যঞ্চ বায়ুশ্চ বিসর্জ্জয়িতব্যঞ্চ পাদৌ চ গন্তব্যঞ্চ মনশ্চ মন্তব্যঞ্চ বুদ্ধিশ্চ বোদ্ধব্যঞ্চাহঙ্কারশ্চারাহঙ্কর্ত্তব্যঞ্চ চিত্তঞ্চ চেতয়িতব্যঞ্চ তেজশ্চ বিদ্যোতয়িতব্যঞ্চ প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যঞ্চ।" অর্থাৎ "তিনি যখন তেজে অভিভূত হন, তখন (অর্থাৎ সুষুপ্তি কালে) সেই দেব স্বপ্ন দেখেন না, তখন এই শরীরে সুখ অর্থাৎ সুষুপ্তিলব্ধ সুখ হয়। হে সৌম্য, সেই বিষয়ক দৃষ্টান্ত এই,—যেমন পক্ষিগণ বাসার্থ বৃক্ষ আশ্রয় করে, তেমনি (যে সকল বস্তুর নাম করা হইতেছে) সেই সমস্তই পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবী ও পৃথিবীমাত্রা অর্থাৎ পৃথিবীর মূলোপকরণ, জল ও জলমাত্রা, তেজ ও তেজমাত্রা, বায়ু ও বায়ুমাত্রা, আকাশ ও আকাশমাত্রা, চক্ষু ও দ্রষ্টব্য, শ্রোত্র ও শ্রোতব্য, ঘ্রাণ ও ঘ্রাতব্য, আস্বাদেন্দ্রিয় ও আস্বাদয়িতব্য, ত্বক্ ও স্পর্শয়িতব্য, বাক্ ও বক্তব্য, হস্ত ও গ্রহীতব্য, উপস্থ ও আনন্দয়িতব্য, বায়ু ও বিসর্জ্জ-

য়িতব্য, পাদ ও গন্তব্য, মন ও মন্তব্য, বুদ্ধি ও বোদ্ধব্য, অহংবোধ ও তদ্বিষয়, চিত্ত ও চেতয়িতব্য অর্থাৎ চিন্তার বিষয়, আলোক ও প্রকাশয়িতব্য, প্রাণ ও প্রাণদ্বারা সংগ্রন্থনীয় [সমুদয় কার্য্যকারণ নামরূপাত্মক বস্তু, এই সমস্ত সুষুপ্তিকালে আত্মাতে সম্প্রতিষ্ঠিত থাকে]।" জগতের স্থায়িত্বজ্ঞান আমাদের কিরূপে হয় তাহা পাঠক এখন কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

জগতের স্থায়িত্ব-জ্ঞান

আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের পূর্ব্বেও জগৎ থাকে,—স্থায়ী জগৎ আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানে অস্থায়ী জ্ঞান-রূপে প্রকাশিত হয়,—একথা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু জগতের থাকার অর্থ যে জ্ঞানে থাকা, জ্ঞানী আত্মাতে থাকা, তাহা লোকে বুঝে না। আমাদের জ্ঞানে জগৎ বিজ্ঞান-সমন্বিত আত্মারূপে প্রকাশিত হয়, আত্মনিরপেক্ষ রূপে প্রকাশিত হয় না, এই প্রত্যক্ষ ব্যাপার হইতে আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে জগতের থাকার অর্থই আত্মাতে থাকা। প্রত্যেক জ্ঞান-ক্রিয়াতে যে বিশ্বাত্মা তাঁহার আশ্রিত বিশ্বের এক অংশ লইয়া আমাদের আত্মারূপে প্রকাশিত হন, তাহা এখন পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন। আমরা আমাদের লব্ধ জ্ঞান মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হারাইয়া ফেলি। কিন্তু যে পরমাত্মা আমাদের ব্যষ্টি আত্মার আশ্রয়, তিনি সেই জ্ঞানকে পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত করিয়া এবং নব নব জ্ঞানের সহিত মিলিত করিয়া আমাদের জগৎ-জ্ঞান বৃদ্ধি করেন,

জগৎ যে একটী স্থায়ী বিজ্ঞানসমষ্টি এই প্রতীতি বদ্ধমূল করেন। কাল জ্ঞান-প্রকাশের একটী প্রকরণ বা প্রণালী মাত্র। আমাদের জ্ঞানক্রিয়া কালে ঘটে, কিন্তু জ্ঞান-ক্রিয়ায় যে গোটা জ্ঞানবস্তুটী প্রকাশিত হয় তাহা কালাধীন নহে। দর্শন স্পর্শাদি পরম্পরাগত ক্রিয়াপ্রবাহের সঙ্গে যদি জ্ঞানরূপী আত্মাও প্রবাহিত হইত, তবে ক্রিয়াপ্রবাহের জ্ঞানই সম্ভব হইত না। এই কথা আমরা স্মৃতি-বিস্মৃতির আলোচনা করিতে যাইয়া সংক্ষেপে দেখাইয়াছি। বর্ত্তমান লেখকের প্রণীত 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'র দ্বিতীয়াধ্যায়ে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। পাঠক উক্ত পুস্তকের বাঙ্গালা বা ইংরেজি সংস্করণ পড়িবেন। কালের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত অপর মুহূর্ত্তের সহিত যুক্ত এবং অনাদি অনন্ত এক মহাকালের অন্তর্গত। কালাতীত পরমাত্মা এই মহাকালের যোগ-সূত্র, এই কর্ম্মপ্রবাহের রচয়িতা। তিনি কালাতীত থাকিয়া নিজ জ্ঞানকে কালে প্রকাশিত করেন, ইহাই সৃষ্টির মূল কথা।

দেশ ও দেশাতীত

তিনি যেমন কালাতীত থাকিয়া নিজ জ্ঞানকে কালে প্রকাশিত করেন, তেমনি তিনি দেশাতীত থাকিয়া নিজ জ্ঞানকে দেশে প্রকাশিত করেন, তাহাতেই জগতের বিবিধ বস্তুর উৎপত্তি হয়। দেশ কাল উভয়ই তাঁহার সৃষ্টির প্রকরণ বা আকার। এই বইখানা দেশে বিস্তৃত, ইহার উপর, নীচ, দক্ষিণ, বাম, মধ্য,

প্রত্যেক অংশ অপর অংশের বাহিরে। ইহা চারি দিক্‌কার বস্তু হইতে ভিন্ন, চারি দিক্‌কার বস্তু ইহার বাহিরে। কিন্তু ইহা যে জ্ঞাতার জ্ঞানে প্রকাশিত, যাহাকে আমরা আমাদের আত্মা বলি, সেই জ্ঞাতার মধ্যে এই বহির্ভাব, এই ভিন্নত্ব, এই অন্যত্ব নাই। আত্মা যদি বিস্তৃত বস্তু হইত, ইহার মধ্যে যদি একান্ত ভিন্নত্ব, একান্ত অন্যত্ব থাকিত, তবে ইহা দেশ এবং দেশস্থ বস্তুর বিভাগ জানিতে পারিত না। অবিস্তৃত, দেশাতীত, অবিভক্ত, অদ্বিতীয় বস্তু হওয়াতেই ইহা বিস্তৃত, দেশস্থিত, খণ্ডাকার, ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর জ্ঞাতা ও আশ্রয় হইতে পারিয়াছে। আমি এই বয়ের এক অংশে আবদ্ধ থাকিলে অন্য অংশকে জানিতে পারিতাম না। এক অর্থে আমরা, জীবাত্মারা, সসীম বটে; আমাদের ইন্দ্রিয়-ঘটিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান সীমাবদ্ধ বটে; কিন্তু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞানে একান্ত ভেদ নাই। ফলতঃ প্রত্যক্ষছাড়া পরোক্ষ নাই, পরোক্ষছাড়া প্রত্যক্ষ নাই। যাহাকে আমরা ইন্দ্রিয়ঘটিত জ্ঞান বলি তাহার সঙ্গে ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান, বুদ্ধি বা অনুমান-ঘটিত জ্ঞান, অবশ্যম্ভাবী রূপে জড়িত। এই বই এবং ইহার নিকটবর্ত্তী বস্তুগুলিই আমার সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয়, কিন্তু দূরের বস্তুগুলির জ্ঞান, এই দেশখণ্ডের বহিঃস্থিত বস্তুর জ্ঞান, এই সাক্ষাৎ জ্ঞানের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রহিয়াছে। 'এখানে'র জ্ঞান হইতেই পারে না 'সেখান'কে ছাড়িয়া। 'এখান'ছাড়া 'সেখান' অর্থহীন, 'সেখান'ছাড়াও 'এখান'

অর্থহীন। আমার প্রত্যক্ষ দেশকে অবশ্যম্ভাবীরূপেই আমাকে অসীম দেশের অংশ বলিয়া ভাবিতে হয়, জানিতে হয়, এবং এই ভাবা ও জানা সম্ভব হয় না আমার আত্মাকে অনন্ত, সর্ব্ব দেশের আশ্রয়, না ভাবিয়া। ফলতঃ আমার মধ্যে অনন্ত আছেন বলিয়াই আমি অসীম দেশ জানিতে সমর্থ হইয়াছি। কিন্তু দেশের অসীমত্ব আত্মার অসীমত্বের ছায়ামাত্র। দেশমাত্রেরই সীমা আছে, ইহার বাহিরে অন্য দেশ আছে। ইহা প্রকৃত পক্ষে অনন্ত নহে, অনির্দ্দেশ্য। কিন্তু ইহা যাঁহার আশ্রিত, যাঁহার জ্ঞানের বিষয়, সেই আত্মা অবিভক্ত, দেশাতীত, তাঁহার বাহিরে কিছুই নাই, সকলই তাঁহার অন্তর্গত, তাঁহার সহিত এক। তিনিই ঠিক অর্থে অনন্ত।

এতক্ষণে আমরা উপনিষদের ভূমাতত্ত্বে আসিলাম। এই ভূমাতত্ত্ব উপনিষদের নানা স্থানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ভূমাতত্ত্ব

সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়াছেন দেবর্ষি সনৎকুমার। ছান্দোগ্য উপনিষদের সমগ্র সপ্তমাধ্যায় এই ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। দেবর্ষি নারদ নিজের অধীত অপরা বিদ্যায় অতৃপ্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভের আশায় সনৎকুমারের শরণাপন্ন হইয়াছেন। সনৎকুমার তাঁহাকে নাম, বাক্, মন প্রভৃতি পূর্ব্ব হইতে শ্রেষ্ঠতর পরবর্ত্তী তত্ত্ব-পরম্পরায় লইয়া গিয়া অবশেষে শ্রেষ্ঠতম তত্ত্ব 'ভূমায়' উপনীত হইয়াছেন। পরবর্ত্তী তত্ত্বগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী তত্ত্বগুলি

অপেক্ষা কি অর্থে শ্রেষ্ঠ তাহা সকল স্থলে বোঝা যায় না। সেই জন্য আমরা ঋষির ব্যাখ্যার অধিকাংশ ছাড়িয়া দিয়া কেবল শেষ তত্ত্ব 'ভূমার' আলোচনায়ই আবদ্ধ থাকিব। ঋষি ভূমার যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাতে সহজেই বোঝা যায় 'ভূমা' সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, অন্য সকল তত্ত্ব ইহার অন্তর্ভূত। তাঁহার প্রদত্ত 'ভূমার' সংজ্ঞা এই,—"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্। যো বৈ ভূমা তদমৃতম্ যদল্পম্ তন্মর্ত্ত্যম্।"—"যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শোনা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না, তাহাই ভূমা (অনন্ত)। আর যাহাতে অন্য কিছু দৃষ্ট হয়, অন্য কিছু শ্রুত হয়, অন্য কিছু বিজ্ঞাত হয় তাহাই অল্প (সসীম, সান্ত)। যাহা ভূমা তাহাই অমৃত, আর যাহা অল্প তাহাই মরণশীল"। (ছান্দোগ্য ৭।১)। তৎপরে নারদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ"—"হে ভগবন্, সেই ভূমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত?" যাহাতে সমুদয় প্রতিষ্ঠিত তাহার সম্বন্ধে এরূপ প্রশ্ন করিলে বোধ হয় যে প্রশ্নকর্ত্তা ভূমার প্রকৃতি বুঝেন নাই। সনৎকুমার যেন এই সন্দেহ করিয়াই প্রথমে বলিলেন "স্বে মহিম্নি"—"তিনি তাঁহার মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত"। কিন্তু লোকে গো অশ্ব প্রভৃতি সম্পত্তিকে নিজ মহিমা বা ঐশ্বর্য্য বলে। এরূপ স্থলে মহিমা বাহিরের বস্তু, সসীম বস্তু। ভূমার পক্ষে এরূপ

বাহিরের বস্তু কিছু নাই। কি জানি নারদ ভূমার মহিমাকে ভূমা অপেক্ষা অন্য কিছু বস্তু মনে করেন তাই সনৎকুমার পূর্ব্বোক্ত উত্তর দিয়াও তাহা প্রত্যাহার করিলেন এবং বলিলেন—"যদি বা ন মহিম্নীতি"—"অথবা তিনি স্বীয় মহিমাতেও প্রতিষ্ঠিত নহেন"। দ্বিতীয় শ্রুতিতে এই উত্তরের অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে। অতঃপর সনৎকুমার ভূমার উপলব্ধিক্রম এবং উপলব্ধির ফল নির্দ্দেশ করিতেছেন,—"স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদম্ সর্ব্বমিতি,"—"তিনিই অধোভাগে, তিনিই ঊর্দ্ধভাগে, তিনিই পশ্চাদ্ভাগে, তিনিই পুরোভাগে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই বামে,—তিনিই এই সমুদয়।" ভূমাকে 'সঃ' বলাতে মনে হইতে পারে তিনি 'অহম্' হইতে একান্ত ভিন্ন। এই ধারণা পরিহার করিবার জন্য ঋষি বলিতেছেন,—"অথাতোঽহংকারাদেশ এব,—অহমেবাধস্তাদ্ অহমুপরিষ্টাদ্ অহং পশ্চাদ্ অহং পুরস্তাদ্ অহং দক্ষিণতোঽহমুত্তরতোঽহমেবেদং সর্ব্বমিতি।"—"এখন অহংদৃষ্টিতে উপদেশ,—আমিই অধোভাগে, আমিই ঊর্দ্ধভাগে, আমিই পশ্চাদ্ভাগে, আমিই পুরোভাগে, আমিই দক্ষিণে, আমিই বামে,—আমিই এই সমুদয়।" অতঃপরও যদি সন্দেহ থাকে যে ভূমা ও আত্মা এক কি না, সেই সন্দেহ পরিহারের জন্য ঋষি বলিতেছেন,—"অথাত আত্মাদেশ এব,—আত্মৈবাধস্তাদ্ আত্মোপরিষ্টাদ্ আত্মা পশ্চাদ্ আত্মা পুরস্তাদ আত্মা দক্ষিণতঃ

আত্মা উত্তরত আত্মৈবেদম্ সর্ব্বমিতি।”—“অনন্তর আত্ম-দৃষ্টিতে উপদেশ,—আত্মাই অধোভাগে, আত্মাই ঊর্দ্ধভাগে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই পুরোভাগে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই বামে,—আত্মাই এই সমুদয়।” ভূমোপলব্ধির ফল সম্বন্ধে অনেক বলা হইয়াছে, আমরা কিঞ্চিন্মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি,—“স বা এষ এবং পশ্যন্ এবং মন্বান এবং বিজানন্ আত্মরতি রাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড় ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। অথ যেঽন্যাথাঽতো বিদুরন্যরাজান স্তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি। তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবতি।”—“যিনি এই প্রকার দর্শন করেন, এই প্রকার মনন করেন, এই প্রকার বিজ্ঞান লাভ করেন, তিনি আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন এবং আত্মানন্দ হন এবং তিনি স্বরাট্ (স্বাধীন) হন। সমুদয় লোকে তাঁহার ইচ্ছানুসারে গমনের অধিকার হয়, এবং যাহারা ইহা হইতে অন্যরূপ জানে তাহারা অন্যের অধীন হয় এবং ক্ষয়শীল লোক লাভ করে। সমুদয় লোকে তাহাদের ইচ্ছানুসারে গমনের অধিকার হয় না।”

অষ্টম অধ্যায়

নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ

ঔপনিষদ্ ঋষিদের মতদ্বৈধ

আমরা ইতিমধ্যে যে তিন জন ঔপনিষদ ঋষির মত আলোচনা ও ব্যাখ্যা করিলাম,—যাজ্ঞবল্ক্য, ইন্দ্র ও সনৎ-কুমার,—তাঁহাদের সকলেরই মত এই যে আত্মা বা ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়, অনন্ত, তাঁহার বাহিরে, তাঁহার অতিরিক্ত, কোন বস্তু নাই; কোন বিজাতীয় অচেতন বস্তুও নাই, কোন সজাতীয় সচেতন বস্তুও নাই; যাহাদিগকে জীবাত্মা বলা হয় তাহারা তাঁহারই আশ্রিত, তাঁহারই অনুপ্রকাশ। কিন্তু ব্রহ্মের সম্বন্ধে বিজাতীয় বা সজাতীয় ভেদ না থাকিলেও তাঁহার স্বগত ভেদ, তাঁহার অন্তর্গত ভেদ আছে। আমাদের সপ্তমাধ্যায়ে একথা বিশেষ স্পষ্ট হইয়া থাকিবে। তাহাতে আমরা দেখাইয়াছি যে দেশ-কাল ব্রহ্মেরই আশ্রিত, যদিও তিনি দেশাতীত ও কালাতীত। আরো দেখাইয়াছি যে জীবাত্মার জ্ঞান ও শক্তি দেশ-কালের সীমায় প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু সেই জ্ঞান ও শক্তি দেশ-কালাতীত ব্রহ্মের আশ্রিত। এই অধ্যায়ে আমরা দেখাইব যে ব্রহ্মের এই স্বগত ভেদ সকল ঋষিই স্বীকার করেন বটে, স্বীকার না করিলে কথাই বলা যায় না, সাধন-ভজন করা তো দূরের কথা, কিন্তু কেহ

কেহ এই ভেদকে স্পষ্টরূপে না হউক্ প্রকারান্তরে মিথ্যা বলেন এবং ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে ভেদশূন্য অভেদ বস্তু মনে করেন। তাঁহাদের মতে ভেদটা আপাত ও অস্থায়ী, জীবের চরমাবস্থায় এই ভেদ থাকে না; সেই অবস্থায় সে ব্রহ্মে লীন, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, হইয়া যায়। এই মত হইতেই পরবর্ত্তী মায়াবাদ বিকশিত হইয়াছে। উপনিষদে স্পষ্ট মায়াবাদ নাই, কিন্তু কোন কোন ঋষির উপদেশে তাহার বীজ আছে। অন্য দিকে কোন কোন ঋষি এই বীজাকার মায়াবাদেরই প্রতিবাদ করিয়াছেন। উপনিষদের ব্যাখ্যাকারগণ,—শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতি আচার্য্যগণ,—ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ঋষিগণকে একমতাবলম্বী বলিয়া মনে করিতেন, সুতরাং প্রত্যেকেই তাঁহাদিগকে নিজমতের অনুকুল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা প্রধান প্রধান ঔপনিষদ্ ঋষিগণের মধ্যে অন্ততঃ দুটী দার্শনিক মত দেখিতেছি, (১) নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ, (২) সবিশেষ বা বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ। কে কোন্ মতের সমর্থক, এবং কি যুক্তি দ্বারা তাঁহারা নিজমত সমর্থন করিয়াছেন, আমরা তাহা যথাসাধ্য দেখাইতেছি।

নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা বা প্রথম ব্যাখ্যাকার উদ্দালক আরুণি। ছান্দোগ্যের ষষ্ঠাধ্যায়ে তাঁহার মত সবিস্তার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা কল্পনা

ও দৃষ্টান্তবহুল; ইহাতে যুক্তির ইঙ্গিত অতি অল্প। বৃহদা-

মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ

রণ্যক ৬।৩।৭ মতে যাজ্ঞবল্ক্য আরুণির শিষ্য। কিন্তু তিনি আরুণির শিষ্য হইলেও তাঁহার অদ্বৈতবাদ-ব্যাখ্যা আরুণির ব্যাখ্যা অপেক্ষা স্পষ্টতর ও প্রশস্ততর। যাজ্ঞবল্ক্যের মত বৃহদারণ্যকের নানা স্থানেই আছে। সেসকল স্থানের পরিচয় পাঠক আমাদের পঞ্চমাধ্যায়ে কতক পাইয়াছেন। আমরা প্রধানতঃ ১।৪, ৪।২ এবং ৪।৩ ও ৪ অবলম্বন করিয়া তাঁহার মত ব্যাখ্যা করিব। ২।৪ ও ৪।৫এ তিনি মৈত্রেয়ীকে শিক্ষা দিয়াছেন যে বস্তুমাত্রই আত্মা, এক অখণ্ড আত্মা, অনাত্মবস্তু বলিয়া কোন বস্তু নাই। কিন্তু তিনি দেখিতেছেন যে আমরা জীবিত ও জাগ্রদবস্থায় রূপ দেখি, রস আস্বাদন করি, গন্ধ আঘ্রাণ করি, শব্দ শুনি, উষ্ণ, শীতল এবং কঠিন, কোমল বস্তু স্পর্শ করি। আরো দেখিতেছেন যে আমরা পরস্পরকে জানি এবং অভিবাদন করি। এসমস্ত জ্ঞান এবং কার্য্য একই বস্তুর অর্থাৎ আত্মার জ্ঞান ও কার্য্য, আত্মাই জানে, আত্মাই জ্ঞানের বিষয় হয়, এবং আত্মাই করে, আত্মাই কৃত হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু আত্মাছাড়া বস্তু যখন নাই তখন এই ভেদকে,—জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, কর্ত্তা-কার্য্য, এই দ্বৈতভাবকে,—কিরূপে সত্য বলা যায়? ঋষি একের সঙ্গে দুয়ের, অভেদের সঙ্গে ভেদের, কোন সামঞ্জস্য দেখিতে পান না। তাঁহার আরো বোধ হইতেছে যে মৃত্যুকালে এই ভেদ থাকে

না। ৪।৩ এ তিনি দেখাইবেন যে জীবিতাবস্থায়ও নিদ্রার সময়ে এই ভেদ চলিয়া যায়। সুতরাং তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে জীবের জীবনে আত্মা যে জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, কর্ত্তা-কর্ম্ম, এই ভেদযুক্ত ভাবে প্রকাশিত হয়, মরণাবস্থায় সে ভেদ থাকে না, অথচ সে অবস্থায় আত্মা বিনষ্ট হয় না। সে অবস্থায় তাহার 'সংজ্ঞা' অর্থাৎ বিশেষ বিজ্ঞান, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-ভেদ, বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহার সাধারণ বিজ্ঞান অবিনাশী। সাধারণ বিজ্ঞান বস্তুটা তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই, কেবল ইহার একটা দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। এক খণ্ড সৈন্ধব লবণ কোন জলপাত্রে রাখিয়া দিলে লবণখণ্ডটা জলে মিশিয়া যায়। ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু পাত্রের যে অংশ হইতেই জল লইয়া আস্বাদন করা যাক্ না কেন, সর্ব্বত্রই জল লবণাক্ত বোধ হয়। বিশ্বব্যাপী আত্মা এরূপ। অজ্ঞানী তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারে না, কিন্তু জ্ঞানী সর্ব্বত্রই তাঁহাকে অনুভব করেন। কিন্তু মানুষের যে এই বিশেষ বিজ্ঞান,—বিষয়জ্ঞান, আত্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মানুভূতি—তাহা মৃত্যুর পরে থাকে না, তাহা তখন জগদাত্মার সাধারণ বিজ্ঞানে লীন হইয়া যায়। আমরা ঋষির বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি। সৈন্ধব খণ্ডের দৃষ্টান্ত দিয়া ঋষি বলিতেছেন, "এবং বা অর ইদং মহদ্ভূতম্ অনন্তম্ অপারং বিজ্ঞানঘন এব। এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি"—"তেমনি, অয়ি মৈত্রেয়ি, এই মহাভূত অনন্ত

অপার ও বিজ্ঞানঘন। (এই মহান্ আত্মা) এই সমুদয় (বিশেষ বিশেষ) ভূত হইতে (জীবাত্মারূপে) উত্থিত হইয়া এ সমুদায়েই আবার বিনাশ প্রাপ্ত (অর্থাৎ তিরোহিত) হন। মৃত্যুর পরে (আর তাঁহার) সংজ্ঞা (বিশেষ বিজ্ঞান) থাকে না।" দেহান্তে আত্মার সংজ্ঞা থাকে না, একথা শুনিয়া মৈত্রেয়ী বিস্মিতা হইলেন এবং বলিলেন একথার অর্থ তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। তাঁহার আশঙ্কা হইয়া থাকিবে যে এই মতে প্রকারান্তরে আত্মার অমরত্ব অস্বীকার করা হইতেছে। আমরা সেখানে উপস্থিত থাকিলে আমাদেরও এই আশঙ্কা হইত। যাহা হউক্, যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর আশঙ্কা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিলেন (৪।৫।১৪),—"ন বা অরেঽহং মোহং ব্রবীমি। অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মা অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা।"—"অয়ি মৈত্রেয়ি, আমি মোহজনক কিছু বলিতেছি না। এই আত্মা অবিনাশী এবং উচ্ছেদবিহীন।" তবে জীবচৈতন্য ও পরমচৈতন্য একপ্রকার নহে। জীবাবস্থায় জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদ থাকে। কিন্তু বস্তু তো একই, সেই এক বস্তু নিজেকে জানিবে কিরূপে বা কিসের দ্বারা? এক বস্তুর ভিতরে জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদ কিরূপে হইবে? সুতরাং এই ভেদ সত্য নহে। যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি এই,—"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরমভিবদতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং বিজানাতি।

যত্র বা অস্য সর্ব্বং অত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ তৎ কেন কমভিবদেৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ। যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তৎ কেন বিজানীয়াৎ বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াদিতি।"—"যে স্থলে মনে হয় যেন দ্বিতীয় বস্তু আছে সেস্থলে এক অপরকে আঘ্রাণ করে, এক অপরকে দর্শন করে, এক অপরকে শ্রবণ করে, এক অপরকে অভি-বাদন করে, এক অপরকে মনন করে, এক অপরকে জানে। কিন্তু যখন ইহার পক্ষে সমুদয়ই আত্মা হইয়া যায়, তখন সে কাহাদ্বারা কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কাহাদ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে, কাহাদ্বারা কাহাকে শ্রবণ করিবে, কাহাদ্বারা কাহাকে অভিবাদন করিবে, কাহাদ্বারা কাহাকে মনন করিবে, কাহা-দ্বারা কাহাকে জানিবে? যাঁহাদ্বারা এই সমুদয়কে জানা যায় তাঁহাকে কাহাদ্বারা জানিবে? অয়ি মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে কাহাদ্বারা জানিবে? (২।৪।১৪)। 'বিজ্ঞাতারম্' পদটা বোধ হয় এস্থলে অনবধানবশতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে, কারণ যে স্থলে একান্ত অভেদ সেস্থলে বিজ্ঞাতা কোথায়? জ্ঞেয়ের সঙ্গে ভেদেই জ্ঞাতা হয়। যাহা হউক্, যাজ্ঞবল্ক্যের উপরি-উক্ত মতের মর্ম্ম এই যে অভেদ জ্ঞানবস্তুটাই অবস্থাবিশেষে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় এই ভেদযুক্ত আকার ধারণ করে। সেই অবস্থায় জ্ঞাতা জ্ঞানবস্তুদ্বারা জ্ঞেয়কে জানে। সেই অবস্থা যখন থাকে না তখন কে কাহার দ্বারা কাহাকে জানিবে? যে বস্তুঃ

জ্ঞাতা হইয়া জ্ঞেয়কে এবং নিজকে জানে, অভেদের অবস্থায় কিরূপে তাহা জ্ঞানের বিষয় হইবে? আচ্ছা বেশ। কিন্তু এখন প্রশ্ন এই যে সেই বস্তু যখন অজ্ঞেয়, তখন তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে, কেবল স্বরূপ কেন, অস্তিত্ব সম্বন্ধেই বা কোন কথা কিরূপে বলা যায়? যাহা কিছু জ্ঞেয় ও বর্ণনীয় তাহা তো কেবল ভেদের অবস্থা সম্বন্ধেই খাটে, যে অবস্থাকে আমরা ভেদাভেদ বলিয়াছি। কিন্তু এই জানা ও বলা যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট 'ইব' মাত্র, আপাতমাত্র। এই অবস্থায় থাকিয়া যদি যাজ্ঞবল্ক্য কোন একান্ত অভেদ বস্তুর কথা বলিয়া থাকেন, তবে তাহাও 'ইব' মাত্র, আপাতমাত্র, তাহা তত্ত্বজ্ঞান নহে, দাঁড়াইবার স্থান নহে।

"মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ" অবলম্বন করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের নির্ব্বিশেষ-অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে কেবল এই মাত্রই বক্তব্য। এখন আমরা

জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ

তাঁহার মতের বিস্তৃততর ব্যাখ্যা বৃহদারণ্যক ৪।৩ ও ৪এর আলোচনা করিব। সেস্থলে রাজর্ষি জনক ব্রহ্মর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"কিং জ্যোতি-রয়ং পুরুষঃ"—"এই পুরুষের অর্থাৎ জীবাত্মার জ্যোতি কি?" সে কোন্ আলোকে চলে ফেরে? কোন্ আলোকে কাজ করে? কে তাহার চালক? আপাততঃ মনে হয় সূর্য্য, সূর্য্যের অভাবে চন্দ্র, চন্দ্রের অভাবে অগ্নি অর্থাৎ প্রদীপ আমাদের চালক। অন্ধকার ঘরে, যেখানে এই তিনের একটীও নাই, সেখানে বাক্ আমাদের চালক। কাহারও বাক্য

শুনিয়া আমরা ঘরে যাই বা ঘর হইতে বাহিরে যাই। জাগ্রদবস্থায় এসকলই যে আমাদের আলোক বা চালক তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপাততঃ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; এসকল যে প্রকৃত চালক নহে, প্রকৃত চালক যে আরো সূক্ষ্মতর, তাহা তিনি এখন বলিতেছেন না। জাগ্রদবস্থা ছাড়িয়া তিনি স্বপ্নাবস্থা ধরিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন 'এখানে জ্যোতি কে? চালক কে?' জাগ্রদবস্থায় আমরা যে সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করি,—গাড়ি, ঘোড়া, পুকুর, নদী, সুখ, দুঃখ, ভয়, স্বপ্নাবস্থায়ও সে সমস্তই প্রত্যক্ষ করি। অথচ বাহিরের বস্তু, যে সকল বস্তু সূর্য্য চন্দ্রাদিদ্বারা প্রকাশিত, সেসকল বস্তু এই অবস্থায় নাই। এই অবস্থায় আত্মা স্বয়ংপ্রভ, সে নিজের জ্যোতিতেই সকল বিষয় জানে। ঋষি ইঙ্গিত করিতেছেন যে লোকে বাহির-ভিতর, আত্মা-অনাত্মা, এই যে ভেদ করে, সেই ভেদ অমূলক। স্বপ্নাবস্থার জগৎ যেমন আত্ম-প্রতিষ্ঠিত, আত্ম-সাপেক্ষ, জাগ্রদবস্থার জগৎও তেমনি আত্ম-প্রতিষ্ঠিত, আত্ম-সাপেক্ষ, অনাত্ম জগৎ বলিয়া কোন জগৎ নাই। রূপরসাদিযুক্ত বস্তু জাগ্রদবস্থায় যেমন আত্মনিরপেক্ষ মনে হয়, স্বপ্নাবস্থায়ও তেমনি মনে হয়। এরূপ মনে হওয়া উভয় স্থলেই ভুল। যাহা হউক্, আত্মনিরপেক্ষ বস্তু যে নাই, আত্মা যে এক, অদ্বিতীয়, এক-রস; বিচিত্র বহু বস্তু যে কেবল ভানমাত্র, তাহা (যাজ্ঞবল্ক্যের মতে) সুষুপ্তির অবস্থায়ই খুব স্পষ্টরূপে দেখা যায়। তখন

আত্মা জলের মত এক হইয়া যায়—'সলীল একঃ'। এই অবস্থায় জাগতিক, পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক, সর্ব্ব প্রকার ভেদ লুপ্ত হইয়া যায়। (৪।৩-২২)। তখন যে আত্মার দর্শন শ্রবণাদি শক্তি বিনষ্ট হয় তাহা নহে; এসকল শক্তি অবিনাশী; কিন্তু তখন তাহা হইতে অন্য, দ্বিতীয়, বিভক্ত এমন কিছু থাকে না যাহা সে জানিবে। তখনকার দর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন, কথন, শ্রবণ, মনন, স্পর্শন, বিজ্ঞান,—এ-সমস্ত কার্য্য সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য একই ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা প্রথম ও শেষ বর্ণনাটী উদ্ধৃত করিতেছি; এই দুটী বর্ণনা হইতে পাঠক এবিষয়ে তাঁহার মত বুঝিতে পারিবেন,—"যদ্ বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়ম্ অস্তি ততোঽন্যদ্ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ",—"যে অবস্থায় সে দেখে না, সে অবস্থায় সে দেখিয়াও দেখে না, কারণ অবিনাশিত্ব বশতঃ দ্রষ্টার দৃষ্টির বিলোপ নাই। কিন্তু সে অবস্থায় তাহা হইতে অন্য, দ্বিতীয়, বিভক্ত এমন কিছু থাকে না যাহা সে দেখিবে। (৪।৩।২৩) "যদ্ বৈ তন্ন বিজানাতি বিজানন্ বৈ তন্ন বিজানাতি ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্ বিভক্তং যদ্ বিজানীয়াৎ।"—"যে অবস্থায় সে জানে না, সে অবস্থায় সে জানিয়াও জানে না, কারণ অবিনাশিত্ববশতঃ বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানের বিলোপ নাই।

কিন্তু সে অবস্থায় তাহা হইতে অন্য, দ্বিতীয়, বিভক্ত এমন কিছু থাকে না যাহা সে জানিবে।" (৪।৩।৩০) এখন, এসকল উক্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে যাজ্ঞবল্ক্যের অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট নহে। উক্তিগুলি পাঠ করিলে কখনও কখনও মনে হয় যে তাঁহার উদ্দেশ্য কেবল সকল অবস্থায় আত্মার মৌলিক একত্ব প্রদর্শন,—বহু, ভিন্ন ও আপাত-বিভক্ত বস্তুসমূহের মধ্যেও যে আত্মা এক, অভিন্ন, ও অবিভক্ত; বহু, ভিন্ন ও বিভক্ত বস্তুসমূহ যে এক, অভিন্ন, অবিভক্ত আত্মাকে অবলম্বন করিয়া আছে, তাহাই স্পষ্ট করিয়া দেখান। আবার কখনও মনে হয় যে সুষুপ্তির অবস্থাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে অভেদের অবস্থাই মনে করেন এবং তদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ভেদের অলীকত্ব, অপ্রকৃতত্ব দেখাইতে যান। বোধ হয় তাঁহার মতে ঐ অবস্থায় প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান থাকে না, জ্ঞানের শক্তিমাত্র থাকে, আত্মাতে এমন ক্ষমতা থাকে যে সে ভেদময় জগৎ পুনরায় উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু একবার জ্ঞান হারাইলে যে সেই জ্ঞান আবার পাওয়া অসম্ভব, জ্ঞান পুনরায় পাওয়াতে যে প্রমাণ হয় তাহা নিশ্চয়ই ছিল, এ কথা আমরা আমাদের সপ্তম অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছি। জ্ঞানের আসা-যাওয়াতে সসীম-অসীমের ভেদাভেদ প্রমাণ হয়,—জ্ঞান পাওয়া, হারান, আবার পাওয়া, এসকল যে কেবল সসীম আত্মার পক্ষেই সম্ভব, অসীমের জ্ঞান

নিত্যসিদ্ধ অপরিবর্ত্তনীয়, একথা আমরা ঐ অধ্যায়ে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। যাজ্ঞবল্ক্য আত্মার মৌলিক অভেদ ভাবে এত বিভোর হইয়াছিলেন যে সসীম-অসীমের, জীব-ব্রহ্মের, ভেদের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে নাই, অথবা যদি পড়িয়া থাকে তবে এত অল্প পড়িয়াছে যে সেভেদ তাঁহার কাছে অসত্য বলিয়া বোধ হইয়াছে। অসীমের কাছে মুহূর্ত্তের জন্যও ভেদরূপ অসত্য কিরূপে প্রতিভাত হয়, সে চিন্তা বোধ হয় তাঁহার মনে উঠে নাই। তিনি এক, অদ্বিতীয়, অসীমকেই জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থার অধীন বলিয়া বুঝিয়াছেন এবং সুষুপ্তিকে ভেদশূন্য অভেদের অবস্থা মনে করিয়া উহাকেই ব্রহ্ম-স্বরূপের সূচক এবং জীবের শেষ গতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির উপরে যে একটী চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থা আছে, যাহাতে জ্ঞান অপরিবর্ত্তিত আকারে বর্ত্তমান থাকে, এবং তাহাই যে ব্রহ্মের স্বরূপ এবং জীবের পূজা ও সম্ভোগের বিষয়রূপে প্রাপ্য, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রজাপতি, ইন্দ্র, চিত্র প্রভৃতি ঔপনিষদ্ ঋষিগণ একথা বুঝিয়াছিলেন। আমরা আমাদের নবমাধ্যায়ে তাহাই দেখাইব।

চতুর্থাধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য জীবাত্মার পুনর্জ্জন্ম ও মুক্তির কথা বিশেষভাবে বলিয়াছেন। আমরা পরে ভিন্নশীর্ষক অধ্যায়ে তাঁহার ও অন্যান্য ঋষির পরলোক সম্বন্ধীয়

মত ব্যাখ্যা করিব। এখানে যাজ্ঞবল্ক্যের মত বিষয়ে এই মাত্র বক্তব্য যে যাঁহারা সম্যক্‌রূপে অবিদ্যা ও কামনা হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্যের মতে তাঁহারা দেহান্তে ব্রহ্মে লীন হন। যাহারা অল্পাধিক পরিমাণে অবিদ্যা ও কামনার অধীন তাহাদের পুনঃ পুনঃ জন্মান্তর হয়।

মুক্তি ও পুনর্জ্জন্ম বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের মত

নবম অধ্যায়

বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ

প্রজাপতি ও ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদ

'ছান্দোগ্য' উপনিষদের অষ্টমাধ্যায়ে যে প্রজাপতি ও ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ আছে, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাঠক আমাদের চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়াংশে পাইয়াছেন। এখন ইহার সহিত তাঁহাকে বিশেষরূপে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। ইহার আখ্যায়িকা-ভাগের ঐতিহাসিক মূল্য কিছুই নাই, আর না থাকাতে কোনও ক্ষতিও নাই। কিন্তু আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আখ্যায়িকার আকারে ব্যাখ্যা করিলেই সুগম ও হৃদয়গ্রাহী হয়, সেই জন্যই ঋষিগণ অনেক স্থলে তাঁহাদের সাধনলব্ধ সত্য এই আকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই কারণে আখ্যায়িকাগুলি অনৈতিহাসিক হইলেও মূল্যবান্। আর এইটুকু ঐতিহাসিক মূল্য ইহাদের থাকিতেও পারে যে সম্ভবতঃ গুরুশিষ্য-সংবাদরূপেই আলোচ্য তত্ত্ব প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল। গুরু এবং শিষ্যদ্বয়ের চরিত্র সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে তাহা এক অর্থে ঐতি-হাসিকই বটে। প্রজাপতি চরম সত্য একবারে প্রকাশ করেন নাই, ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়াছেন। শিষ্য যে পূর্ব্ব সংস্কার লইয়া গুরুর নিকট যান তাহা একেবারে ভাঙ্গিয়া

দেওয়া সম্ভব নহে। উহা অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর চিন্তার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ইহার ভ্রম বা অসম্যক্‌ত্ব দেখাইতে হয়। বাস্তব জগতে শ্রেষ্ঠ গুরুগণের শিক্ষাদান কার্য্যে আমরা এরূপ প্রণালীই দেখিতে পাই। ইন্দ্র ও বিরোচনের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাও আমরা বাস্তব জগতে সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। বিরোচন প্রথমে যাহা শুনিলেন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন, আর গুরুর নিকট আসিলেন না। তিনি চিন্তা ও বিচারশূন্য শিষ্য। ইন্দ্র তাঁহার বিপরীত; তিনি বিচারদ্বারা গুরূপদেশের অসম্যক্‌ত্ব বুঝিয়া তিন বার তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং অবশেষে চরম সত্য লাভ করিলেন। যাহা হউক্, আমরা সংক্ষেপে আখ্যায়িকাটী বলি, পাঠক মূল গ্রন্থে উহা বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন। উপদিষ্ট বিষয়টীই বিশেষ চিন্তা ও আলোচনার যোগ্য, সেবিষয়েই আমরা কিছু বিস্তৃতভাবে বলিব। দেবতা এবং অসুর উভয় শ্রেণীর জীবই শুনিলেন যে প্রজাপতি আত্মা সম্বন্ধে এই শিক্ষা দিতেছেন,—"য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাস সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্ব্বাংশ্চ লোকান্ আপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানম্ অনুবিদ্য বিজানাতি"—"যে আত্মা পাপরহিত, জরারহিত, মৃত্যুরহিত, শোকরহিত, অশনেচ্ছারহিত, পিপাসারহিত, যিনি সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, তাঁহাকেই অন্বেষণ

করিতে হইবে, তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিতে হইবে। যিনি তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হন, তিনি সমুদয় লোক ও সমুদয় কাম্য বস্তু লাভ করেন।" (ছা ৮।৭।১)। এমন লোভনীয় তত্ত্ব বুঝিবার জন্য দেবতাদের দিক্ হইতে ইন্দ্র এবং অসুরদের পক্ষ হইতে বিরোচন প্রজাপতির নিকট উপনীত হইলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইল যে তাঁহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক গুরুগৃহে ৩২ বৎসর বাস করিতে হইবে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রজাপতি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসাই করিলেন না তাঁহারা কি শিখিতে আসিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্যশেষে তাঁহাদের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে এই প্রথম উপদেশ দিলেন,—"য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মা"—"চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, ইনিই আত্মা"। আরো স্পষ্ট করিয়া বলিলেন,—"এতদ্ অমৃতম্ অভয়ম্ এতদ্ ব্রহ্ম"। ইনিই অমৃত, অভয় এবং ইনিই ব্রহ্ম"। যাহা বলিলেন তাহা তো সত্যই। সমুদায়ই তো ব্রহ্ম, চক্ষুতে দৃষ্ট পুরুষ ব্রহ্ম হইবেন না কেন ? কিন্তু সমস্ত জগতে ব্রহ্মদৃষ্টির শক্তি তো শিষ্যদের এখনও হয় নাই। এমন কি দৃষ্ট-দ্রষ্টার ভেদ পর্য্যন্ত তাঁহারা বুঝেন নাই, ভেদাভেদ বোঝা তো দূরের কথা। তাঁহাদের অধিকারানুসারে তাঁহারা বুঝিলেন যে চক্ষুর ভিতর যে দ্রষ্টার শরীরের ছায়া পড়ে তাহাকেই প্রজাপতি আত্মা ও ব্রহ্ম বলিতেছেন। এরূপ ছায়া, জলে এবং দর্পণেও দেখা যায়। তাঁহারা গুরুকে

জিজ্ঞাসা করিলেন ঐ ছায়া কে? গুরু বলিলেন—'সমুদায়ের মধ্যে এই আত্মাই দৃষ্ট হন।' গুরুর নির্দ্দেশানুসারে তাঁহারা পরিষ্কৃত, সুবসন ও স্বলঙ্কৃত হইয়া জলপাত্রে নিজ নিজ শরীরের প্রতিবিম্ব দেখিলেন এবং যাহা দেখিলেন তাহা গুরুকে বলিলেন। গুরু পূর্ব্ববৎই উত্তর দিলেন—যাহা দেখা হইয়াছে তাহাই আত্মা, তাহাই ব্রহ্ম। উত্তরটী অসত্য নহে, কিন্তু অসম্যক্। চিন্তার উচ্চতর স্তরে না উঠিলে ইহার অসম্যক্ত্ব বোঝা যায় না। অনেক লোক সেই স্তরে আদৌ উঠে না, তাহারা দেহকেই আত্মা মনে করে এবং প্রকারান্তরে উহাকেই ব্রহ্ম বা পরম বস্তু বোধে সারাজীবন উহারই সেবা করে। বিরোচন তাহাই বুঝিলেন এবং অসুর লোকে ফিরিয়া গিয়া এই 'আসুরী উপনিষদ'ই প্রচার করিলেন। পক্ষান্তরে ইন্দ্র বিরোচনের সঙ্গে গুরুগৃহ পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু দেবলোকে ফিরিবার পূর্ব্বেই প্রজাপতির উপদেশের অসন্তোষকরত্ব বুঝিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন আত্মা সম্বন্ধে প্রজাপতির যে উপদেশ শুনিয়া তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন,—"য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকঃ" ইত্যাদি, তাহার সঙ্গে এই দেহাত্মবাদ কিছুই মিলে না। দেহ এবং দেহের প্রতিবিম্বই যদি আত্মা হয় তবে দেহ সুসজ্জিত হইলে যেমন আত্মা সুসজ্জিত হইবে, তেমনি দেহ অন্ধ ও বধির হইলে আত্মাও অন্ধ ও বধির হইবে। সুতরাং তিনি পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া গুরুর নিকট নিজ সন্দেহ নিবেদন

করিলেন। গুরু তাঁহাকে আরো ৩২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক থাকিতে বলিলেন। এই সময়ের পর তিনি ইন্দ্রকে যে উপদেশ দিলেন তাহার মর্ম্ম এই যে স্বপ্নে আমরা নিজেকে যেরূপ দেখি, অর্থাৎ বাহ্যবস্তু হইতে পৃথক্‌রূপে দেখি, তাহাই আত্মা, তাহাই ব্রহ্ম। আপাততঃ ইন্দ্র এই উপদেশেই সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বেই অসন্তোষের সহিত গুরুর নিকট প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার সন্দেহ এই,—নিদ্রাবস্থায় আমরা বাহিরের ভয় বিপদ হইতে মুক্ত হই বটে, কিন্তু স্বপ্নেও তো যথেষ্ট ভয় দুঃখ আছে। জাগ্রদবস্থার স্থূল বিপদের সঙ্গে স্বপ্নাবস্থার সূক্ষ্ম বিপদের বিশেষ প্রভেদ কি? ইন্দ্র বুঝিলেন যে, যে আত্মতত্ত্বের আকর্ষণে তিনি প্রজাপতির শরণ লইয়াছিলেন, সেই আত্ম-তত্ত্ব এখনও তাঁহার আয়ত্ত হয় নাই। গুরু তাঁহাকে আরও ৩২ বৎসর থাকিতে বলিলেন। সেই সময়ান্তে প্রজাপতি ইন্দ্রকে যে উপদেশ দিলেন, তাহাই জনকের প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যের চরম উপদেশ, অর্থাৎ সুষুপ্তির অভেদ অবস্থাই আত্মার স্বরূপ-সূচক। জনক এই উপদেশেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইন্দ্রও প্রথমে সন্তুষ্ট হইয়া 'শান্তহৃদয়ে' গুরুগৃহ হইতে বাহির হইলেন বটে, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। তিনি সুষুপ্তির নির্ব্বিশেষ ভাবে মুগ্ধ হওয়া দূরে থাক্, ইহার সম্বন্ধে তিনি আন্তরিক উপেক্ষা-সূচক কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার উক্তিগুলি উদ্ধৃত হইবার উপযুক্ত। তিনি প্রজা-

পতিকে বলিলেন,—"নাহং খল্বয়ং ভগব এবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি বিনাশমেবাপিতো ভবতি নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি"।—"হে ভগবন্, এই সময়ে ইহা (অর্থাৎ আত্মা) নিজের বিষয়েই জানিতে পারে না যে 'ইহাই আমি' এবং ইহা ভূতসমূহকেও জানিতে পারে না। এসময়ে ইহা বিনাশই প্রাপ্ত হয়, অথবা যেন বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই উপদেশে আমি ভোগ্য দেখিতেছি না (অর্থাৎ স্পৃহণীয় কোন বস্তুর পরিচয় পাইতেছি না)।" (ছা ৮।১১।২)। প্রজাপতি ইন্দ্রের মুখ দিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিপাদিত নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদের শূন্যতা দেখাইলেন। দেখাইলেন যে নির্ব্বিশেষ 'আত্মায়' আত্মজ্ঞানও নাই, অনাত্মজ্ঞানও নাই; জ্ঞানিত্বও নাই, জ্ঞেয়ত্বও নাই। যাহাতে এদুয়ের কিছুই নাই তাহাতে আত্মত্বের বা ব্রহ্মত্বের কি থাকিতে পারে? কিন্তু সুষুপ্তিকে চরমাবস্থা মনে করিলে এরূপ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য। আমরা আমাদের সপ্তমাধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে সুষুপ্তির উপরে আর একটী চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থা আছে যাহা অপরিবর্ত্তিত ও অপরিবর্ত্তনীয় জ্ঞানের অবস্থা। এই অবস্থাই ব্রহ্মভাব, ব্রহ্মের স্বরূপ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই পরিবর্ত্তন-প্রবাহ জীবের; ব্রহ্মের নহে। প্রজাপতি এখন তাহাই দেখাইতে যাইতেছেন। সুষুপ্তি সম্বন্ধে ইন্দ্রের মন্তব্যের উত্তরে তিনি বলিলেন,—"হে মঘবন্, ইহা (অর্থাৎ সুষুপ্তি) এই প্রকারই। এবিষয়ে

(অর্থাৎ আত্মার সম্বন্ধে) তোমাকে পুনরায় উপদেশ দিব এবং প্রকৃত আত্মা হইতে অন্য কিছু ব্যাখ্যা করিব না। তুমি আরো পাঁচ বৎসর বাস কর"। পাঁচ বৎসর পরে প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন,—"মঘবন্ মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরং আত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যাশরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানম্। আত্তো বৈ সশরীর প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাম্। ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি। অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ"।—"হে মঘবন্, এই শরীর মর্ত্ত্য এবং মৃত্যুগ্রস্ত। (কিন্তু) ইহাই এই অমৃত অশরীর আত্মার অধিষ্ঠান। শরীরী আত্মার প্রিয়াপ্রিয়-সংযোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয় না (অর্থাৎ ইহা প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুর সহিত সর্ব্বদাই সংযুক্ত থাকে)। অশরীর আত্মাকে প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে না।" (ছা ৮।১২।১) এস্থলে ঋষি শরীর এবং আত্মার ভেদ করিতেছেন, আবার শরীরী আত্মা এবং অশরীর আত্মার মধ্যেও ভেদ করিতেছেন। আত্মা ও অনাত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে পূর্ব্ব ব্যাখ্যাত উপনিষদদর্শন যদি পাঠক বুঝিয়া থাকেন, তবে এখন স্মরণ করিবেন যে এইমাত্র ঋষি যে ভেদ করিলেন তাহা একান্ত ভেদ নহে, অভেদের অবিরোধী ভেদ। উপনিষদ্ মতে জড় বা অনাত্মা বলিয়া কোন বস্তু নাই, জগৎ আত্মময়। সেমতে মৃত্যু বলিয়াও কোন ব্যাপার নাই, যাহাকে লোকে মৃত্যু বলে তাহা অবস্থান্তরমাত্র। শরীর যে আত্মা হইতে একান্ত ভিন্ন নহে, তার অন্য প্রমাণছাড়া

ঋষির একথাই প্রমাণ যে শরীর আত্মার অধিষ্ঠান। এই অধিষ্ঠান সর্ব্বদাই আত্মাদ্বারা অধিষ্ঠিত থাকে; আত্মাধিষ্ঠিত না হইয়া কিছুই থাকিতে পারে না। শরীর যে অবস্থাই প্রাপ্ত হউক্, ইহা সকল অবস্থাতে বিশ্বাত্মার অধিষ্ঠান হইয়াই থাকে। বিশ্বাত্মা কোন বস্তুকেই কখনও ছাড়িতে পারেন না। এই অর্থে তিনিও শরীরী। তবে ঋষি শরীরী ও অশরীর আত্মার প্রভেদ করিতেছেন কেন? প্রভেদ করিবার হেতু এই যে অজ্ঞানী জীবাত্মা নিজেকে শরীরে বদ্ধ মনে করে, তাহার দেহাত্মবোধ যায় নাই। বিশ্বাত্মা সকল শরীরে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও জানেন তিনি শরীরে বদ্ধ নহেন এবং এই অর্থে তিনি অশরীর। জ্ঞানী জীবাত্মাও নিজের পরিচয় পাইয়া, নিজেকে আর শরীরী মনে করেন না, শরীরের সহিত সংযুক্ত থাকিয়াও নিজেকে অশরীর মনে করেন। যাহা হউক্, এখন ঋষির শেষ কথা,—প্রিয়াপ্রিয় হইতে, সুখ-দুঃখ হইতে, মুক্তির কথা,—শোনা যাক্। এই মুক্তাবস্থার বর্ণনা দিবার পূর্ব্বে তিনি অশরীর অবস্থার একটী দৃষ্টান্ত দিতেছেন। তাঁহার মতে বায়ু, অভ্র, বিদ্যুৎ ও বজ্র, ইহারা অশরীর অর্থাৎ ইহাদের হস্তপদাদি অঙ্গ নাই, বিশেষ কোন অবয়বও নাই। শীতকালে সূর্য্যতেজ বিশেষরূপে না পাওয়াতে ইহারা আকাশে মিশিয়া থাকে, ইহাদের নিজরূপ প্রকাশিত হয় না। শীতান্তে ইহারা সূর্য্যরশ্মি লাভ করিয়া নিজ নিজ প্রকৃতি লইয়া প্রকাশিত হয়। এই মত

অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত নহে। ঋষির বৈজ্ঞানিক মত আমরা গ্রহণ না করিতে পারি, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টান্তটা একান্ত অসমীচীন নহে। যেমন মেঘবজ্রাদি সূর্য্যকিরণের অভাবে আকাশের সঙ্গে মিশিয়া থাকে, আকাশ হইতে ইহাদিগকে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু সূর্য্যকিরণ লাভে ইহারা নিজ নিজ রূপে বিরাজ করে, তেমনি জীবাত্মা যত দিন দেহাত্মবোধের অধীন থাকে তত দিন সে তাহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারে না। কিন্তু যখন সে পরম জ্যোতি লাভ করে তখন সে প্রকৃত স্বরূপে বিরাজ করে, সাংসারিক জীবন সত্ত্বেও সে নিজেকে মুক্ত বোধ করে। ঋষি বলিতেছেন,—"এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে। স উত্তমঃ পুরুষঃ। স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং। স যথা প্রয়োগ্য আচরণে যুক্ত এবমেবায়ং অস্মিঞ্ছরীরে প্রাণো যুক্তঃ"।—"তেমনি এই প্রসাদ-গুণপ্রাপ্ত আত্মা এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া (অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি হইতে মুক্ত হইয়া) পরমজ্যোতিসম্পন্ন হইয়া (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া) বিরাজ করে। তখন ইহা উত্তম পুরুষ (অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত একত্ববোধবশতঃ শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত পুরুষ)। তখন স্ত্রীলোকের সঙ্গেই হউক্ বা যানে আরোহণ করিয়াই হউক্, বা জ্ঞাতিবর্গের সহিতই হউক্, সে আহার করিয়া (বা হাস্য

করিয়া), ক্রীড়া করিয়া এবং আনন্দ উপভোগ করিয়া বিচরণ করিতে থাকে। যে দেহে তাহার জন্ম (অর্থাৎ আবির্ভাব) সেই দেহকে তখন সে ভুলিয়া যায়। যেমন অশ্ব বা বলীবর্দ্ধ রথে যুক্ত থাকে, তেমনই এই প্রাণও দেহে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে" (অর্থাৎ সংযোগটা সাময়িক, চিরস্থায়ী নহে)। (ছাঃ ৮।১২।৩)

আত্মা ও ইন্দ্রিয়ের প্রভেদ

এই সংযোগ শেষ হইলেও যে আত্মার জ্ঞান ও ক্রিয়া চলিবে, তাহা দেখাইবার জন্য ঋষি আত্মা এবং আত্মার বাহ্যিক যন্ত্রের প্রভেদ দেখাইতেছেন, — "অথ যত্রৈতদাকাশম্ অনুবিষণ্ণং চক্ষুঃ (তত্র) সঃ পুরুষঃ। দর্শনায় চক্ষুঃ। অথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি স আত্মা। গন্ধায় ঘ্রাণম্। অথ যো বেদেদং অভিব্যাহারাণীতি স আত্মা। অভিব্যাহারায় বাক্। অথ যো বেদেদং শৃণবানীতি স আত্মা। শ্রবণায় শ্রোত্রম্।"—"যে স্থলে আকাশে (অর্থাৎ চক্ষুর মণিতে) চক্ষু অনুপ্রবিষ্ট সেস্থলে চাক্ষুষ পুরুষ (দ্রষ্টারূপে) বর্ত্তমান; চক্ষু দেখিবার জন্য (অর্থাৎ দর্শনের যন্ত্রমাত্র)। যিনি জানেন 'আমি ইহা আঘ্রাণ করি' তিনিই আত্মা; ঘ্রাণেন্দ্রিয় ঘ্রাণের যন্ত্রমাত্র। যিনি জানেন 'আমি ইহা বলি', তিনিই আত্মা; বাক্ বলিবার যন্ত্রমাত্র। যিনি জানেন 'আমি ইহা শুনি', তিনিই আত্মা; শ্রোত্র শ্রবণের যন্ত্রমাত্র।" (ছাঃ ৮।১২।৪)। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—

জ্ঞানের শক্তি ও কর্ম্মের শক্তি—মনেরই বিবিধ শক্তিনিচয়। জ্ঞান ও কর্ম্ম মননেরই রূপভেদ মাত্র। তাই ঋষি মনকে বলিয়াছেন 'দৈবং চক্ষুঃ'। মনসম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—"অথ যো বেদেদং মন্বানীতি স আত্মা। মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ। স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে।"—"যিনি জানেন 'আমি ইহা মনন করি' তিনিই আত্মা; মন ইহার দৈব চক্ষু। তিনি এই মনোরূপ দৈব চক্ষুদ্বারা সেই সমুদায় কাম্যবস্তু দর্শন করিয়া আনন্দিত হন যে সকল বস্তু ব্রহ্মলোকে আছে।" (ছাঃ ৮।১২।৫)। প্রজাপতির ব্রহ্মলোক ইহলোক পরলোক উভয় লোকব্যাপী। কোথায় ইহলোকের শেষ, পরলোকের আরম্ভ, তাহা তিনি স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার শেষ কথাগুলি পরলোকসম্বন্ধীয় বলিয়াই বোধ হয়। তিনি বলিতেছেন,—"তং বা এতং দেবা আত্মানম্ উপাসতে। তস্মাৎ তেষাং সর্ব্বে চ লোকা আত্তাঃ সর্ব্বে চ কামাঃ। স সর্ব্বাংশ্চ লোকান্ আপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তম্ আত্মানম্ অনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ প্রজাপতিরুবাচ।"—"দেবতাগণ সেই আত্মাকে (অর্থাৎ পরমাত্মাকে) উপাসনা করেন। সেই জন্য তাঁহারা সমুদায় লোক ও সমুদায় কাম্য বস্তু লাভ করেন। যিনি সেই আত্মাকে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হন তিনি সমুদায় লোক ও সমুদায় কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হন, প্রজাপতি এই কথা

বলিলেন, প্রজাপতি এই কথা বলিলেন।" (ছাঃ ৮।১২।৬)। প্রজাপতির এই আত্মতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে পাঠকের অধিগত হইল, বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার আত্মা, তাঁহার ব্রহ্ম, যে যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মের ন্যায় নির্ব্বিশেষ নহেন, তিনি যে অভেদ হইয়াও অসংখ্য ভেদযুক্ত, আশা করি সে বিষয়ে পাঠকের কোন সন্দেহ রহিল না। ইন্দ্র ও চিত্রের উপদেশে এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আরো প্রস্ফুটিত হইয়াছে। আমাদের ষষ্ঠাধ্যায়ে পাঠক ইন্দ্রের মত পাইয়াছেন। চিত্রের মত যথাস্থানে ব্যাখ্যাত হইবে।

দশম অধ্যায়

প্রেমতত্ত্ব

যাজ্ঞবল্ক্যের প্রেমতত্ত্ব-ব্যাখ্যা

পাঠক দেখিয়াছেন যে উপনিষদের কোন কোন স্থলে ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নামে এক প্রকার নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণেই আমরা দেখিয়াছি যাজ্ঞবল্ক্য একটী গভীর প্রেমতত্ত্বের শিক্ষক। নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদের সহিত প্রেমতত্ত্বের সামঞ্জস্য নাই। গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ (বৃহ ৩।৬ ও ৮) প্রভৃতি স্থলে তাঁহার নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতাবাদও সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। উদ্দালক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদকে (৩।৭) তো আচার্য্য রামানুজ তাঁহার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রমাণ বলিয়াই দাবি করেন। এ-সকল অসামঞ্জস্য ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিলে এই মনে হয় যে (১) ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি যাজ্ঞবল্ক্যের নামে ভিন্ন ভিন্ন মত শিক্ষা দিয়াছেন, অথবা (২) ঋষি নিজেই চিন্তার ভিন্ন ভিন্ন স্তরে দাঁড়াইয়া ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন। যাহা হউক্, এখন আমরা উপনিষদুক্ত প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিব, সেই তত্ত্ব যে ঋষিই শিক্ষা দিয়া থাকুন্। বৃহদারণ্যক প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে একটী

শ্রুতি (৮ম) আছে যাহা কোন বিশেষ ঋষির উক্তি বলিয়া কথিত হয় নাই, কিন্তু যাহা মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে উপদিষ্ট প্রেমতত্ত্বের অনুরূপ। সুতরাং ইহাকে যাজ্ঞবল্ক্যের মত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। শ্রুতিটী এই,—"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদ্ অন্তরতরং যদয়মাত্মা। স যোঽন্যম্ আত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতীশ্বরো হ তথৈব স্যাৎ। আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। য চ আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকম্ ভবতি।"—"এই যে (অন্য সমুদায় হইতে) অন্তরতর আত্মা, ইনি পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষা প্রিয়, এই সমুদায় অপেক্ষা প্রিয়। যে ব্যক্তি আত্মা অপেক্ষা অন্য বস্তুকে প্রিয়তর বলিয়া মনে করে, তাহাকে যদি কোন (আত্মজ্ঞ) ব্যক্তি বলেন—'তোমার প্রিয় বস্তু বিনাশ প্রাপ্ত হইবে',—তিনি এপ্রকার বলিতে সমর্থ এবং এপ্রকার ঘটিবেই। সুতরাং আত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। যিনি আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় বস্তু নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।" আচ্ছা, এখন আমরা আবার 'মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে' যাই। সেখানে মৈত্রেয়ীর প্রতি প্রেম জানাইতে যাইয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে

পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। আত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। আত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। আত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। আত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। আত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। আত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।"
—"অয়ি মৈত্রেয়ি, পতির জন্য পতি প্রিয় হয় না, আত্মার জন্যই পতি প্রিয় হয়। জায়ার জন্য জায়া প্রিয়া হয় না, আত্মার জন্যই জায়া প্রিয়া হয়। পুত্রগণের জন্য পুত্রগণ প্রিয় হয় না, আত্মার জন্যই পুত্রগণ প্রিয় হয়। বিত্তের জন্য বিত্ত প্রিয় হয় না, আত্মার জন্যই বিত্ত প্রিয় হয়। ব্রাহ্মণজাতির জন্য ব্রাহ্মণজাতি প্রিয় হয় না, আত্মার জন্যই ব্রাহ্মণজাতি প্রিয় হয়। ক্ষত্রিয়জাতির জন্য ক্ষত্রিয়জাতি প্রিয় হয় না, আত্মার জন্যই ক্ষত্রিয় জাতি প্রিয় হয়। (পৃথিব্যাদি) লোকসমূহের জন্য লোকসমূহ প্রিয় হয় না, আত্মার জন্যই লোকসমূহ প্রিয় হয়। দেবগণের জন্য দেবগণ প্রিয় হন না,

আত্মার জন্যই দেবগণ প্রিয় হন। ভূতসমূহের জন্য ভূতসমূহ প্রিয় হয় না, আত্মার জন্যই ভূতসমূহ প্রিয় হয়। সর্ব্ব বস্তুর জন্য সর্ব্ব বস্তু প্রিয় হয় না, আত্মার জন্যই সর্ব্ব বস্তু প্রিয় হয়।" এই উপদেশের সার কথা এই যে আত্মপ্রীতিই মূল প্রীতি। আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর, নিকটতর, সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবত্তর বলিয়া প্রিয়তম বস্তু। আত্মার সহিত সম্বন্ধ, সম্পর্কিত, আত্মার সুখ বা শ্রেয়ের সাধক বলিয়া অন্য বস্তু প্রিয়। যে বস্তুর সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না, যে বস্তুকে আত্মার শ্রেয়সাধক, সুখসাধক বলিয়া বোধ হয় না, সে বস্তুর প্রতি প্রীতি হয় না। কিন্তু পাঠক দেখিয়াছেন যে উপনিষদের মতে অনাত্ম বস্তু কিছু নাই, সমুদায় বস্তুই এক অখণ্ড আত্মবস্তুর অন্তর্গত,—যাহাকে আমরা নিজ আত্মা বলি, স্বরূপতঃ সেই আত্মারই অন্তর্গত। সুতরাং কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে অনাত্ম মনে করা এবং অনাত্ম অর্থাৎ 'আপনার নয়' বলিয়া ঘৃণা করা অজ্ঞতার ফল। যে পরিমাণে দিব্য জ্ঞান জন্মে, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয়, সেই পরিমাণে পূর্ব্বের উপেক্ষিত ও ঘৃণিত ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি প্রীতি সঞ্চারিত হয়। যখন সকল বস্তুই আত্মা বলিয়া জ্ঞান হয় তখন "আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি,—" আত্মার জন্য সর্ব্ব বস্তুই প্রিয় হইয়া উঠে। "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানম্ ততো ন বিজুগুপ্সতে।"—"যিনি সমুদায় প্রাণীকে আত্মাতে দেখেন,

এবং সমুদায় প্রাণীতে আত্মাকে দেখেন, তিনি আর কাহাকেও ঘৃণা করেন না।" (ঈশা ৬)।

সাধনের উচ্চাবস্থায় মানবই যখন প্রেমপূর্ণ হয়, বিশ্ব-প্রেমিক হয়, তখন ব্রহ্মের সম্বন্ধে আর কথা কি ? তাঁহার নিকট অনাত্ম কিছুই নাই, কেহই নাই, সুতরাং অপ্রিয়ও কিছুই নাই। তাঁহার আত্মপ্রেমের অর্থই বিশ্বপ্রেম। আর তিনি যখন পূর্ণ, অনন্ত, তখন তাঁহার প্রেমও পূর্ণ, অনন্ত। প্রত্যেক সসীম আত্মা তাঁহার অনন্ত প্রেমের পাত্র। প্রেমের লক্ষণই শিবত্ব, মঙ্গলময়ত্ব, প্রেমপাত্রের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ততা। সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে ঈশ্বর প্রত্যেক সসীম আত্মার কল্যাণের জন্য চিরব্যস্ত। কিন্তু আমরা যে কেবল যুক্তি তর্ক দ্বারা পরোক্ষ ভাবে ঈশ্বরের শিবত্ব সিদ্ধান্ত করি তাহা নহে। তাঁহার শিবত্ব আমাদের সাক্ষাৎ অনুভবের বিষয়। তিনি আমাদের প্রত্যেকের আত্মারূপে প্রকাশিত। আমাদের জ্ঞান ও শক্তিতে যেমন তাঁহার জ্ঞান ও শক্তির সাক্ষাৎ প্রকাশ, আমাদের প্রেমেও তেমনি তাঁহার প্রেমের সাক্ষাৎ প্রকাশ। উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার তো কথাই নাই, সাধারণ অবস্থায়ও এক অর্থে মানবাত্মা প্রেমপূর্ণ। আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ সকলকে আপন মনে করিতে পারি না, কিন্তু যাহাদিগকে আপন মনে করি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপেই ভালবাসি এবং তাহাদের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইতে প্রস্তুত আছি। নিজের মঙ্গল কি তাহা সকল সময় বুঝি

না, কখন কখন অমঙ্গলকেও মঙ্গল বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু যাহা নিজের মঙ্গল বলিয়া মনে করি তাহা করিতে ব্যস্ত হই। এই যে আমাদের আত্মপ্রেম ও পরপ্রেম, ইহা ঈশ্বরেরই প্রেম। বস্তু একই, কেবল প্রকাশক্রমের তারতম্য। আমাদের প্রেম আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান ও শক্তির সীমায় পরিচ্ছিন্ন, ব্রহ্মপ্রেমে সেই সীমা নাই। অন্তরে প্রকাশিত এই প্রেম,—যাহা সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল ও অত্যাচারকে ঘৃণা করে,—তাহাই ব্রহ্ম-প্রেমের সাক্ষাৎ প্রমাণ। এই সাক্ষাৎ প্রমাণ বুঝিলে আর জাগতিক কোন প্রহেলিকাময় ঘটনায় ঈশ্বরপ্রেমের উপর সন্দেহ আসে না। ঘটনা বাহিরের ব্যাপার; উহার মূল আমাদের নিকট লুক্কায়িত। ঘটনার মূল কেবল অন্তরেই দেখা যায়। অন্তরে আমরা কেবল মঙ্গলেচ্ছাই দেখি। যে অমঙ্গল কার্য্য করে সেও অজ্ঞানতা বশতঃ অমঙ্গলকে মঙ্গল বলিয়া ভ্রম করে। যে মঙ্গল জানিয়াও করিতে পারে না, তাহার মঙ্গলেচ্ছা তাহার অশক্তিদ্বারা সীমাবদ্ধ। আমরা নিজ হৃদয়ে নির্ম্মল প্রেমের পরিচয় পাইয়া বুঝিতে পারি ঈশ্বর-প্রেম পূর্ণ ও অসীম, তাহা অজ্ঞান ও অশক্তি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। সুতরাং জাগতিক যে ঘটনা দুঃখ ও বিষাদ আনয়ন করে, তাহার মূলে কি মঙ্গল লুক্কায়িত আছে তাহা সাক্ষাৎভাবে না দেখিলেও আমরা অন্তরালোকে ঈশ্বরের পূর্ণ প্রেম সাক্ষাৎ ভাবে অনুভব করিয়া বুঝিতে পারি দৃশ্যমান দুঃখ বিপদের পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোন মঙ্গল সঙ্কল্প বিদ্যমান আছে।

উপনিষদের নানা স্থানে জীবের প্রতি ব্রহ্মপ্রেমের উল্লেখ আছে। দুটী স্থল বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ। কেনোপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক আখ্যায়িকায় বলা হইয়াছে দেবাসুর যুদ্ধে দেবতারা জয়ী হইয়া নিজ বীর্য্যের স্পর্দ্ধা করিতেছেন। এই অশুভকর অহংকার হইতে তাঁহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য ব্রহ্ম 'যক্ষ' রূপে তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া অগ্নি ও বায়ুকে দেখাইয়া দিলেন যে তাঁহাদের নিজ শক্তি কিছুই নাই। ইহাতেও তাঁহাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল না, তাঁহারা ব্রহ্মকে সর্ব্বশক্তির আধার বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। অবশেষে দেবরাজ ইন্দ্র হিমালয়ে প্রকাশিতা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী উমার প্রসাদে ব্রহ্মের পরিচয় পাইলেন। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটী আরও উজ্জ্বল। সেটী আছে কৌষীতকি উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ে। ব্রহ্মজ্ঞ জীবাত্মা নানা অবস্থার ভিতর দিয়া ব্রহ্মলোকের প্রথম দ্বার 'আরো হ্রদঃ' রিপুরূপ হ্রদের তীরে উপনীত হইলে ব্রহ্মপ্রেরিতা শ্রুতি ও মানসিক শক্তিরূপিণী অপ্সরাগণ তাঁহাকে নানাবিধ ব্রহ্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ এই রূপে ব্রহ্মবলে বলীয়ান হইয়া সেই রিপুহ্রদ, তৎপর ইষ্টহানিকর মুহূর্ত্তসমূহ, তৎপর বিজরানদী এবং সর্ব্বশেষে ইল্য অর্থাৎ পার্থিব ভাবরূপ বৃক্ষ অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ ব্রহ্মগন্ধ, ব্রহ্ম-রস, ব্রহ্মতেজ ও ব্রহ্মযশ সম্ভোগ করিতে করিতে ব্রহ্মধামে ব্রহ্মসন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং উপাসনারূপিণী নদীতীরে

ব্রহ্মপ্রেম-বিষয়ক আখ্যায়িকা

দেবতাদের সহবাসে বাস করিতে লাগিলেন। আমরা যথা স্থানে এই যাত্রার বিশেষ ব্যাখ্যা দিব।

উপনিষদ্-বর্ণিত ব্রহ্মপ্রেম,—জীবের প্রতি ব্রহ্মপ্রেম এবং ব্রহ্মের প্রতি জীবের প্রেম,—অবলম্বন করিয়াই পরবর্ত্তী ভক্তি ও প্রেমের শাস্ত্র লিখিত হইয়াছে। প্রেমময় ভগবানই প্রেমভক্তির পরমাস্পদ এবং জীব ভগবৎপ্রেমের পাত্র এবং ভগবৎপ্রকাশের কেন্দ্র বলিয়াই সাধকের চিরপ্রেম-ভাজন। আমরা যথাস্থানে শাস্ত্রোক্ত এসকল সাধনের কথা বলিব।

একাদশ অধ্যায়

শ্রেয় ও প্রেয়

যম ও নচিকেতার আখ্যায়িকা

কঠোপনিষদে যম ও নচিকেতার সংবাদাকারে শ্রেয় ও প্রেয়ের প্রভেদ দেখান হইয়াছে এবং প্রেয়ের পথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ের পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আখ্যায়িকাটী যে আধ্যাত্মিক জীবনের একটী রূপক, তাহা আমরা আমাদের তৃতীয়াধ্যায়ে সংক্ষেপে বলিয়াছি। বাজশ্রবা যজ্ঞাদি কর্ম্মের সাধক, কিন্তু কর্ম্মে তাঁহার শ্রদ্ধা নাই। বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দান করিতে হয়, কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত গোসমূহ দানের অনুপযুক্ত। তাঁহার পুত্র নচিকেতা বালক হইলেও শ্রদ্ধাবান্, কর্ম্মফলে তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস আছে। পিতার প্রদত্ত দক্ষিণা দেখিয়া তাঁহার অনাস্থা হইল। তিনি পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় কোন্ ঋত্বিককে দিবেন?" তিনি নিজেকে পিতার সম্পত্তি মনে করিয়া ভাবিয়াছেন তিনিও যজ্ঞের দক্ষিণারূপে প্রদত্ত হইবেন। কিন্তু এত বড় দক্ষিণা কেন, সুস্থ, সবল গোদানেও বাজশ্রবার ইচ্ছা ছিল না, তাই পুত্রের কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি বলিলেন,—"তোমায় মৃত্যুকে দিব।" লৌকিক ধর্ম্মে শ্রদ্ধা হারাইয়া কেবল লোকাচারের অনুরোধে কর্ম্ম করিতে থাকিলে সাধকের

কিরূপ মনোভাব হয়, এই ঘটনাদ্বারা ঋষি সংক্ষেপে তাহাই দেখাইয়াছেন। পক্ষান্তরে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অগ্নিসাধ্য কর্ম্ম-সাধকের রূপক বা আদর্শ নচিকেতা (অগ্নির নামান্তর)। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দেবোদ্দেশে যে-কোন কর্ম্ম করা যায় তাহাতেই চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্তশুদ্ধির অবশ্যম্ভাবী ফল—কর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুর আভাস পাওয়া এবং সেই শ্রেষ্ঠবস্তু-বিষয়ক উপদেশ লাভের উপযুক্ত হওয়া। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক লৌকিক ধর্ম্মসাধন করিতে করিতে যখন সাধক নিজ মৃত্যু বা কোন প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যুর সম্মুখীন হন, তখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভের একটী বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হয়। আখ্যায়িকায় নচি-কেতার সেই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল এবং তিনি সম্পূর্ণ রূপেই সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। যম তাঁহাকে দেবলোকের সমস্ত ভোগ দানের প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু তিনি সেই সমুদায়ের অসারতা কীর্ত্তন করিয়া আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। নানা প্রলোভন ও পরীক্ষা দ্বারা নচিকেতাকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত বুঝিয়া যম তাঁহাকে শিষ্যত্বে বরণ করিলেন। যমের প্রথমোপদেশই শ্রেয় ও প্রেয়ের প্রভেদ। অজ্ঞানাবস্থায় লোক সমস্ত জগৎই অনাত্মরূপে দেখে। তাহার মনে হয় জগৎ অসংখ্য সসীম বস্তুর সমষ্টি। এসকল বস্তুর মধ্যে অনেক বস্তুই ইন্দ্রিয়-সুখের উপায় বলিয়া চিত্তাকর্ষক। কেবল সুখের উপায় বলিয়া, কেবল 'ভাল লাগে' বলিয়া, বস্তুর অন্বেষণই

'প্রেয়'। জীবনের নিম্নাবস্থায় অবশ্যম্ভাবিরূপেই লোকে প্রেয়ের পথে চলে। কিন্তু মানুষের ভিতরে প্রেয় অপেক্ষা উচ্চতর আর একটী বস্তু আছে। 'ভাল লাগা' বা 'ভাল না লাগা' ছাড়াও একটী কর্ম্মপ্রবৃত্তি আছে। যাহা সত্য, যাহা মহৎ, যাহা উচিত, যাহা শুভ, তাহা সুখকর হউক্ আর দুঃখকর হউক্ তাহাই অনুসরণীয়,—এই সেই কর্ম্ম-প্রবৃত্তি। ইহাই শ্রেয়ের পথ। মানুষ যত দিন বিশেষ ভাবে প্রেয়ের অধীন থাকে, যত দিন তাহার শ্রেয়োবোধ প্রবল না হয়, যত দিন সে শ্রেয়ের অনুরোধে প্রেয় ছাড়িতে না পারে, তত দিন তাহাকে উচ্চ সত্য, উচ্চ ধর্ম্ম, শিক্ষা দিবার চেষ্টা বৃথা। যাহা হউক্, পাঠক বোধ হয় এখন শ্রেয় ও প্রেয়ের প্রভেদ বুঝিলেন। প্রেয়ের পথ অবিদ্যার পথ, শ্রেয়ের পথ বিদ্যার পথ। প্রেয়ের পথ মিথ্যার পথ, শ্রেয়ের পথ সত্যের পথ। প্রেয়ের পথ সুখ বা আপাত-সুখের পথ, শ্রেয়ের পথ সুখ-দুঃখ-নিরপেক্ষ কর্ত্তব্যের পথ। প্রেয়ের পথে প্রাপ্য কেবল 'অল্প', সসীম বস্তু, শ্রেয়ের পক্ষে প্রাপ্য অসীম, 'ভূমা'। কিন্তু এই প্রভেদ সত্ত্বেও পরিণামে দেখা যায় শ্রেয় ও প্রেয় পরস্পরের একান্ত বিরোধী নহে। অবিদ্যার ভিতরে বিদ্যা, অসত্যের ভিতরে সত্য, লুক্কায়িত থাকে, ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। সসীমের ভিতরে অসীম লুক্কায়িত থাকেন, ক্রমশঃ প্রকাশিত হন। সুখ-দুঃখ-নিরপেক্ষ হইয়াই কর্ত্তব্য সাধন করিতে হয়, নচেৎ প্রকৃত পক্ষে

কর্ত্তব্য করাই হয় না। কিন্তু ক্রমশঃ কর্ত্তব্যসাধন সুখকর হইয়া উঠে। সসীম সুখকর হইতে পারে, কিন্তু তাহার সুখ অল্প ও ক্ষণস্থায়ী। অসীমকে সুখ-নিরপেক্ষ হইয়াই অন্বেষণ করিতে হয়, কিন্তু অবশেষে দেখা যায় একমাত্র অসীমই পূর্ণ ও স্থায়ী সুখের আধার। সুতরাং সাধনারম্ভে শ্রেয়-প্রেয়ের ভেদ অপরিহার্য্য বটে, কিন্তু সাধনের উচ্চাবস্থায় শ্রেয়ই প্রেয় হইয়া দাঁড়ান এবং যাহাকে প্রথমে প্রেয়মাত্র বলিয়া বোধ হইয়াছিল তাহাকে শ্রেয়ের অংশরূপে অনুসরণ করিলে তাহার সঙ্গে শ্রেয়ের বিরোধ ও প্রভেদ চলিয়া যায়।

পন্থা-ভেদ

শ্রেয়-প্রেয়ের ভেদ হইতে ভারতীয় ধর্ম্মে একটী বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। এক দিকে অবিদ্যা-মূলক দ্বৈতবাদ, জড় ও আত্মার, সসীম ও অসীমের, একান্ত ভেদ, এবং এই ভেদমূলক বহুদেববাদ এবং তাহার সাধন সকাম যজ্ঞাদি কর্ম্ম। এই সাধনের উদ্দেশ্য ইহলোক ও পরলোকে নানাবিধ সুখভোগ। এই পথের নামান্তর 'পিতৃযান'। অপর দিকে বিদ্যামূলক অদ্বৈতবাদ,—নির্ব্বিশেষ বা সবিশেষ,—এবং এই অদ্বৈতমূলক ব্রহ্মবাদ এবং তৎসাধন নিষ্কাম কর্ম্ম ও বিশুদ্ধ জ্ঞান-ভক্তি। এই সাধন-পথের নামান্তর দেবযান। এই গ্রন্থে ব্রহ্মবাদের সাধনই বিশেষ-রূপে আলোচ্য। সেই সাধন-তত্ত্বের সহিত লৌকিক ধর্ম্মের প্রভেদ এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়

সাধনের স্তরভেদ

পাঠকের মনে হইতে পারে যে এত ক্ষণ যাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা তত্ত্ব বা মতমাত্র, সাধন নহে। স্থূলদর্শী উপদেষ্টা তত্ত্ব ও সাধনের ভিতরে একান্ত ভেদ করেন এবং মত বা তত্ত্ব উপেক্ষা করিয়া সাধনে মনোযোগ দিতে বলেন। মত বা তত্ত্ব অবিচারিত ভাবে গ্রহণ করা হইতেই এই একান্ত ভেদ আসে। সন্দেহ, অনুসন্ধান, চিন্তা ও বিচার-দ্বারা সত্য লাভ করিবার চেষ্টা করিলে আর মত ও সাধনের এই একান্ত ভেদ থাকে না। তখন দেখা যায় তত্ত্বলাভ, মতস্থাপন, এসকল ব্যাপারও সাধন-সাপেক্ষ। সুতরাং এত ক্ষণ আমরা যে আলোচনা করিয়াছি,—চিন্তা ও বিচার দ্বারা ব্রহ্মের সত্যতা, জ্ঞান ও প্রেম জানিতে চেষ্টা করিয়াছি,—তাহা তত্ত্বমাত্র নহে, তাহা কঠোর অথচ অতি সুফলপ্রদ সাধনও বটে। চিন্তা ও বিচারকে লোকে কেবল পরোক্ষ ব্যাপার বলিয়া ভুল করে,—মনে করে যেন ইহাতে নিশ্চিতরূপে কিছুই জানা যায় না, ইহা অপেক্ষা গভীরতর প্রণালী আছে যাহাতে আমাদিগকে সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মের সম্মুখীন করে। আমরা ঋষিগণের উক্তি অনুসরণ করিয়া যাহা বলিয়াছি তাহা সূক্ষ্মরূপে

তত্ত্বজ্ঞান সাধন-লভ্য

আলোচনা করিয়া থাকিলে পাঠক দেখিয়া থাকিবেন যে আমাদের অবলম্বিত বিচার-প্রণালী সাক্ষাৎ অনুভূতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। আমরা দেখাইয়াছি যে অনুভূতি ও অনুমান, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, অচ্ছেদ্যরূপে সম্বদ্ধ। যাহা হউক্, এই যে প্রত্যক্ষ-মূলক বিচার, ইহা জ্ঞানের সাধন, —অপরিহার্য্য অবশ্যম্ভাবী সাধন,—হইলেও ঋষিদের মতে ইহা জ্ঞান-সাধনের প্রথম সোপানমাত্র। তাঁহাদের ভাষায় ইহা মনন, বুঝিবার চেষ্টা। ইহার উপরে নিদিধ্যাসন, বিশেষরূপে ধ্যান করা, ধ্যানদ্বারা বস্তুকে ধরিবার চেষ্টা।

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি

এই চেষ্টা ও চেষ্টার ফলকে পরবর্ত্তী সময়ে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। ব্রহ্মকে আত্মা ও বিশ্বরূপে সাক্ষাৎভাবে,—'এই সেই,' এই ভাবে,—ধরার নাম 'ধারণা'। ধারণা শিথিল হইয়া গেলে তাহাকে দৃঢ় করিবার চেষ্টার নাম 'ধ্যান'। এই চেষ্টার ফলে যখন দর্শন বা উপলব্ধি এমন উজ্জ্বল ও গাঢ় হইয়া যায় যে ধ্যেয় ও ধ্যাতার মধ্যে আর কোন ব্যবধান থাকে না, তাঁহারা অবিচ্ছেদ্য হইয়া যান, তখনই তাহাকে বলে 'সমাধি'। সমাধি পূর্ণ আনন্দ ও পবিত্রতার অবস্থা। ইহা মুক্তির পূর্ব্বাভাস। ইহা জীবনে স্থায়ী হইলে ইহাকে বলে 'জীবন্মুক্তি'। ইহা স্থায়ী না হইলেও ইহার গভীরতার তারতম্যানুসারে কার্য্যগত জীবনে ইহার প্রভাব অল্পাধিক পরিমাণে সঞ্চারিত হয়। উপ-

নিষদের নানা স্থানে যে সকল 'বিদ্যা' বা 'উপাসনা' দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে এই অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কোন উপাসনাই প্রকৃত সাধনাবস্থার যথাযথ চিত্র বলিয়া বোধ হয় না। এরূপ চিত্র অঙ্কনের প্রবৃত্তি বা অভ্যাস বোধ হয় উপনিষদের সময়ে হয় নাই। পরবর্ত্তী সাধনসাহিত্যে এরূপ চেষ্টা হইয়াছিল, সেসম্বন্ধে আমরা যথা-স্থানে বলিব। উপনিষদের যে অল্প কয়েকটী স্থলে সাক্ষাৎ সাধনের কিঞ্চিৎ চিত্র দেওয়া হইয়াছে সেস্থল কয়েকটী আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। প্রশ্নোপনিষদের দ্বিতীয় প্রশ্নে রূপকের ভাষায় বলা হইয়াছে যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ প্রাণের অর্থাৎ প্রাণরূপী ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে পারিয়া এই ভাবে তাঁহার স্তুতি করিলেন,—

"এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য্য এষ পর্জ্জনো মঘবানেষ বায়ুরেষ

প্রাণস্তুতি পৃথিবী রয়িদে́ব সদসদমৃতঞ্চ যৎ।

অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।

ঋচো যজুংষি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ॥

প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে ত্বমেব প্রতিজায়সে।

তুভ্যং প্রাণ প্রজাস্ত্বিমা বলিং হরন্তি যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি॥

দেবানামসি বহ্নিতমঃ পিতৃণাং প্রথমা স্বধা।

ঋষিণাঞ্চরিতং সত্যম্ অথর্ব্বাঙ্গিরসামসি॥

ইন্দ্রস্ত্বং প্রাণ তেজসা রুদ্রোঽসি পরিরক্ষিতা।

ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্য্যস্ত্বং জ্যোতিষাম্পতিঃ॥

যদা ত্বমভিবর্ষস্যথেমাঃ প্রাণ তে প্রজাঃ।
আনন্দরূপাস্তিষ্ঠন্তি কামায়ান্নং ভবিষ্যতীতি ॥
ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈকঋষিরত্তা বিশ্বস্য সৎপতিঃ।
বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্বনঃ।
যা তে তনূর্বাচি প্রতিষ্ঠিতা যা শ্রোত্রে যা চ চক্ষুষি।
যা চ মনসি সন্ততা শিবাং তাং কুরু মোৎক্রমীঃ ॥
প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
মাতেব পুত্রং রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি ন ইতি ॥"

অর্থাৎ—"ইনি অগ্নিরূপে প্রজ্জ্বলিত হন, ইনি সূর্য্য, ইনি পর্জ্জন্য, ইনি ইন্দ্র, ইনি বায়ু, এই দেব রয়ি (চন্দ্র), যাহা সৎ (আকারযুক্ত), অসৎ (আকারশূন্য), এবং অমৃত, তাহাও তিনি। যেমন রথচক্রের নাভিতে অরসমূহ সংলগ্ন থাকে. তেমনি সমস্তই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঋক্, যজু, সাম যজ্ঞ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণবর্ণ সকলই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। তুমিই প্রজাপতি, তুমিই গর্ভমধ্যে বিচরণ কর এবং পিতামাতার প্রতিরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ কর। হে প্রাণ, যে তুমি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণসহ বাস করিতেছ, তোমার জন্যই এই প্রাণিসমূহ চক্ষুরাদিযোগে বলি (দৃশ্যাদি ভোগ্য বস্তু) আহরণ করে। তুমি দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ হবিবাহক (অগ্নি), তুমি পিতৃদিগের স্বধা। তুমি ঋষিদিগের সত্যাচরণ, এবং আঙ্গিরস ঋষিদিগের মধ্যে তুমিই অথর্ব্বা। হে প্রাণ, বলে তুমি ইন্দ্র, তুমি রক্ষক-রূপে রুদ্র। তুমি অন্তরীক্ষে বিচরণ কর, তুমি জ্যোতিষ্ক-

মণ্ডলীর পতি সূর্য্য। যখন তুমি মেঘ হইয়া বারি বর্ষণ কর, তখন তোমার সৃষ্ট এই প্রাণিসমূহ ইচ্ছানুরূপ অন্ন হইবে এই ভাবিয়া আনন্দিত হয়। হে প্রাণ, তুমি ব্রাত্য (স্বভাবতঃ শুদ্ধ), তুমি একর্ষি (নামক অগ্নি), সমুদায় ভক্ষ্য দ্রব্যের ভক্ষক এবং সৎপতি। আমরা তোমার ভক্ষ্য দ্রব্যের দাতা। তুমি বায়ুর পিতা (অথবা 'পিতা ত্বং মাতরিশ্ব নঃ' এই পাঠে, হে বায়ো, তুমি আমাদের পিতা)। তোমার যে তনূ বাক্যে, শ্রোত্রে ও চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত, যাহা মনে ব্যাপ্ত, সেই তনূকে শান্ত কর, তুমি উৎক্রান্ত হইও না। এই সমস্ত এবং যাহা স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত, সেই সমস্তই প্রাণের বশে আছে। হে প্রাণ, মাতা যেমন পুত্রদিগকে রক্ষা করেন, তেমনি তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। আমাদিগকে শ্রী ও প্রজ্ঞা প্রদান কর।"

আর একটী স্থল শ্বেতাশ্বতরের চতুর্থাধ্যায়ের আরম্ভ। প্রাণস্তুতির ন্যায় ইহাতেও আরম্ভে প্রথম পুরুষ এবং পরে মধ্যম পুরুষ ব্যবহৃত হইয়াছে,—

অদ্বৈত ভাবে স্তুতি

"যএকোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।
তদেবাগ্নিস্তদাদিত্য স্তদ্বায়ু স্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং
কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥
নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বাঃ॥"

—"যে অদ্বিতীয়, বর্ণরহিত, প্রচ্ছন্নাভিপ্রায় পরমাত্মা নানা শক্তিযোগে অনেক বিষয়ের সৃষ্টি করেন, যাঁহা হইতে সমুদয় জগৎ প্রথমে জন্মে এবং যাঁহাতে অন্তকালে প্রতিগমন করে, সেই দেবতা আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন্। তিনিই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্রমা। তিনিই দীপ্তিমৎ নক্ষত্রাদি, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই প্রজাপতি। তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার এবং তুমিই কুমারী। তুমি জরাগ্রস্ত হইয়া দণ্ডহস্তে গমন কর, তুমি বিশ্বতোমুখ হইয়া জন্মগ্রহণ কর। তুমি নীল পতঙ্গ, লোহিতচক্ষু শুকাদি, মেঘ, ঋতু এবং সাগরসমূহ। অনাদিস্বরূপ তুমি ব্যাপকরূপে রহিয়াছ, যাঁহা হইতে সমুদায় ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে।"

এই শ্বেতাশ্বতরেই দুটী উপাদেয় প্রার্থনা আছে,—

উপনিষদে প্রার্থনা

"যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাপাপকাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি॥".

—"হে রুদ্র, হে গিরিশন্ত (গিরিতে থাকিয়া যিনি গিরিবাসী তপস্বীদিগের সুখ বিস্তার করেন), তোমার যে মঙ্গলস্বরূপা অভয়া পুণ্যপ্রকাশিনী তনূ, সেই সুখতমা তনূদ্বারা আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর।" (৩।৫)

"অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ ভীরুঃ প্রতিপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্॥"

—"তুমি অজাত, এই বলিয়া সংসারভয়ে ভীত কোন ব্যক্তি তোমার শরণ লইতেছে। হে রুদ্র, তোমার যে দক্ষিণ মুখ, তদ্দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর। (৪।২১)

বৃহদারণ্যকে একটী অত্যুৎকৃষ্ট প্রার্থনা আছে,—

"অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়।"—"অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও।" (১।৩।২৮)

ব্রহ্মসাধনের ফল,—তদ্দ্বারা পবিত্রতালাভ—বৃহদারণ্যকে এই রূপে বর্ণিত হইয়াছে,—"এবংবিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাঽত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি সর্ব্বমাত্মানং পশ্যতি। নৈনং পাপ্মা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি। নৈনং পাপ্মা তপতি সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি বিপাপো বিরজো বিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি। এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়েনং প্রাপিতোঽসীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।"

সাধনফল

—"যাজ্ঞবল্ক্য (জনককে) বলিলেন, এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন

ব্যক্তি শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া নিজ আত্মাতেই (পরম) আত্মাকে দর্শন করেন এবং সকল বস্তুকে আত্মরূপে দর্শন করেন। পাপ ইহাকে সন্তপ্ত করিতে পারে না, তিনি সমুদায় পাপ দগ্ধ করেন, ইনি নিষ্পাপ, বিরজ ও সন্দেহরহিত হইয়া (প্রকৃত) ব্রাহ্মণ হন। ইহাই ব্রহ্মলোক। হে সম্রাট, আপনি এই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।" (বৃ ৪।৪।২৩)

ব্রহ্মানন্দ

উপনিষদের নানা স্থানে ব্রহ্মসহবাসের আনন্দ বর্ণিত হইয়াছে। আমরা তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ হইতে একটী স্থল উদ্ধৃত করিলাম,—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি। যদাহ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি।"—"তিনি রসস্বরূপ। এই জীব রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াই সুখী হয়। যদি (হৃদয়) আকাশে এই আনন্দস্বরূপ না থাকিতেন, তবে কেবা অপানচেষ্টা (প্রশ্বাস কার্য্য) করিত, কেই বা প্রাণন (নিশ্বাস কার্য্য) করিত? ইনিই জীবকে আনন্দ দান করেন। যখন এই সাধক এই অদৃশ্য, অশরীরী, অনির্ব্বচনীয়, নিরাধার ব্রহ্মে নির্ভয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন। যখন তিনি ইহাতে

অল্প মাত্রও ভেদ দর্শন করেন (অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করেন) তখন তাঁহার ভয় হয়।”(২।৭)। উদ্ধৃত শ্রুতির কিঞ্চিৎ পরেই মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মা পর্য্যন্ত নানা উচ্চতর জীবের আনন্দের সহিত তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে যে জ্ঞানী এবং নীচকামনামুক্ত সাধকের আনন্দ এসকল কোন আনন্দাপেক্ষা অশ্রেষ্ঠ নহে। বৃহদারণ্যকেও (৪।৩।৩৩) কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ভাষায় ব্রহ্মানন্দের এই ‘মীমাংসা’ করা হইয়াছে। সনৎকুমারের ভূমাতত্ত্ব পাঠক ইতিমধ্যেই অবগত হইয়াছেন। তাঁহার “যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি” এই মহাবাক্য পাঠককে স্মরণমাত্র করাইয়া দিতেছি। ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎ সাধন ও অনুভূতিলভ্য, ইহার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার নিরর্থক।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিশুদ্ধ ও সাংখ্য-মিশ্রিত বেদান্ত

আমরা এপর্য্যন্ত যাহা বলিলাম সেসমস্তই বিশুদ্ধ অমিশ্রিত বেদান্তের কথা। সম্ভবতঃ অনেক দিন পর্য্যন্ত এই বিশুদ্ধ বেদান্তই চলিত ছিল। কিন্তু সাংখ্য-দর্শনের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বেদান্তমত সাংখ্যমতের সহিত মিশ্রিত হইতে লাগিল। এখন যে বেদান্তমত চলিত, তাহার সঙ্গে সাংখ্যমত এত দূর মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যে অমিশ্রিত বেদান্তমত কি তাহা অনেকে বুঝিতেই পারেন না। বিশেষতঃ যাঁহারা উপনিষদ্ শাস্ত্র সূক্ষ্ম ও গভীররূপে অধ্যয়ন করেন নাই, অপেক্ষাকৃত আধুনিক বৈদান্তিক গ্রন্থ হইতে বেদান্তমত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে বিশুদ্ধ বেদান্তমত কি, তাহা জানা বস্তুতঃই কঠিন, কার্য্যতঃ অসম্ভব। যাহা হউক্, আমরা যথাসাধ্য উপনিষদ্-প্রতিপাদিত বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়া এখন সংক্ষেপে সাংখ্যমত ব্যাখ্যা করিব। এই ব্যাখ্যা হইতেই পাঠক কতকটা বুঝিতে পারিবেন ঔপনিষদ ব্রহ্মবাদ হইতে প্রচলিত সাংখ্যমিশ্রিত ব্রহ্মবাদ কত ভিন্ন। আমাদের পরবর্ত্তী আলোচনায় এই ভেদবোধ আরো স্পষ্ট হইবে। আমাদের এই ভেদ দেখাইবার একটী বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।

সাংখ্যদর্শনের সাহিত্য

কেবল আধুনিক বৈদান্তিক গ্রন্থে নহে, যে দুখানা গ্রন্থ ব্রহ্ম-বাদের 'স্মৃতি প্রস্থান' ও 'ন্যায় প্রস্থান' বলিয়া গৃহীত হয়,—'ভগবদ্গীতা' ও 'ব্রহ্মসূত্র'—এই দুখানার ভিতরেও অল্পাধিক পরিমাণে সাংখ্যমত প্রবেশ করিয়াছে। এমন কি, যে দ্বাদশ-খানা উপনিষদকে ব্রহ্মবাদের 'শ্রুতি প্রস্থান' বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহাদের মধ্যেও এক খানাতে,—'শ্বেতাশ্বতর' উপ-নিষদে,—সাংখ্যমত কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। এই কারণেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 'শ্বেতাশ্বতর'কে প্রাচীনতম উপনিষদের মধ্যে গণ্য করেন না। যাহা হউক্, আমরা সংক্ষেপে সাংখ্যমত ব্যাখ্যা করিতেছি। সাংখ্যমতের প্রাচীন সাহিত্য পাওয়া যায় না। 'তত্ত্বসমাস' অপেক্ষাকৃত প্রাচীন হইলেও অতি অসম্পূর্ণ। 'সাংখ্যসূত্রে'র প্রাচীনত্ব নিতান্তই সন্দিগ্ধ। ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা' অতি প্রাচীন না হইলেও নিতান্ত আধুনিক নহে। বিশুদ্ধ সাংখ্যমত জানিবার পক্ষে ইহাই বিশেষ সহায়।

প্রত্যক্ষ ও অনুমান

সাংখ্য অলৌকিক বিষয়ে বেদের প্রামাণিকত্ব স্বীকার করিলে ও দার্শনিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের উপরই নির্ভর করিয়াছেন। এই মতে প্রত্যক্ষ যাহা,—রূপ-রসাদি বিষয়, যাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর, তাহা মূলবস্তু নহে, মূলবস্তুর অস্থায়ী কার্য্য বা বিকৃতিমাত্র। মূলবস্তু অনুমান-গ্রাহ্য,—প্রত্যক্ষ কার্য্য দেখিয়া আমরা কারণরূপে সেবস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত

করি। মূলবস্তু দ্বিবিধ,—(১) পুরুষ অর্থাৎ আত্মা, (২) প্রকৃতি অর্থাৎ জড়শক্তি। সাংখ্য লৌকিক দ্বৈতবাদকেই দার্শনিক আকার দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দার্শনিক দ্বৈতবাদ অতি সূক্ষ্ম, দার্শনিক চিন্তাবিহীন সাধারণ দ্বৈতবাদী তাহা বুঝিতে পারেন না। লোকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকেই প্রকৃতি বা জড় বলে। কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় যে কিছু হইতে পারে না, প্রত্যক্ষের ভিতরে যে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার ও অতীন্দ্রিয় বস্তু জড়িত রহিয়াছে এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মধ্যে যে একান্ত ভেদ নাই, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। লোকে সেকথা বুঝে না, সাংখ্য তাহা কতক বুঝেন, কতক বুঝেন না। কতটা বুঝেন না, তাহা পাঠক ক্রমশঃ দেখিবেন। যাহা হউক্, সাংখ্য মনে করেন ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা যাহা জানি তাহা কার্য্যমাত্র, স্থায়ী বস্তু নহে। কিন্তু অস্থায়ী কার্য্যমাত্রেরই স্থায়ী কারণ চাই, সুতরাং অনুমানদ্বারা সেই কারণ স্থির করিতে হইবে। কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ এবং এই সম্বন্ধের প্রকৃত অর্থ আমরা কোথায় এবং কিরূপে জানি, তাহা সাংখ্য জানেন না, অনুসন্ধানও করেন না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির মধ্যে আমরা যে কার্য্যকারণ-সূত্র কল্পনা করি, যেমন ধূমের কারণ অগ্নি, তাহা যে অতীন্দ্রিয় জগতে আরোপিত হইতে পারে না, তাহা তিনি ভাবেন না। যাহা হউক্, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কার্য্যের অতীন্দ্রিয় কারণ চাই, একথা ধরিয়া লইয়া

তিনি তার একটী অচেতন কারণ, একটী জড়শক্তি, অনুমান করেন। তিনি পুরুষ বা আত্মাকে জগৎকার্য্যের কারণ বলিলেন না কেন? বলিলেন না এই জন্য যে তাঁহার মতে পুরুষ বা আত্মা নিষ্ক্রিয় জ্ঞানমাত্র, তাহার কর্ত্তৃত্ব নাই, সুতরাং সে কারণ হইতে পারে না। এবিষয়ে সাংখ্যমত বিশুদ্ধ বেদান্তমত হইতে যে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহা পাঠক ভাল করিয়া বুঝুন্। উপনিষদের ঋষিদের মধ্যে মতভেদ আছে, তাহা পাঠক দেখিয়াছেন। এক শ্রেণীর ঋষি নির্ব্বিশেষবাদী, অভেদবাদী; আর এক শ্রেণীর ঋষি সবিশেষবাদী, ভেদাভেদ-বাদী, কিন্তু যাঁহারা অভেদবাদী তাঁহারাও ভেদের কারণ খুঁজিতে গিয়া আত্মা বা ব্রহ্মকেই কারণ বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন অভেদ ব্রহ্মই নিজশক্তিতে ভেদযুক্ত হন, বিচিত্র জগৎরূপে প্রকাশিত হন। ব্রহ্ম যে নিষ্ক্রিয়, সুতরাং ক্রিয়া বুঝাইতে হইলে ব্রহ্মাতিরিক্ত একটা জড়শক্তি চাই, একথা তাঁহাদের কল্পনায়ও প্রবেশ করে নাই। যাহা হউক্, সাংখ্যমতে কার্য্যের কারণরূপে জড়শক্তি চাই, কিন্তু সে-মতে চেতনের সান্নিধ্যছাড়া জড় কার্য্য করিতে পারে না। জড়ের পক্ষে চেতনের 'সান্নিধ্যে' যাওয়ার অর্থ কি, তাহা সাংখ্য বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই,—নিজেও বুঝিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। 'সান্নিধ্য' একটা দেশগত সম্বন্ধ, দেশস্থিত বিষয়সমূহের মধ্যে সে সম্বন্ধ থাকিতে পারে, জড়-চেতনের মধ্যে সে সম্বন্ধ কিরূপে থাকিবে? যাহা

হউক্, জড়-চেতনের সান্নিধ্য যেন হইল, তাহাতে তাহারা কিরূপে পরস্পরকে প্রভাবিত করে? সাংখ্যমতে পরস্পরের সান্নিধ্যে প্রকৃতির অব্যক্ত ক্রিয়া-শক্তি ব্যক্ত হয় এবং জ্ঞানমাত্র নিষ্ক্রিয় পুরুষ নিজেকে কর্ত্তা এবং প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ বা বিকারসমূহে অন্বিত বা বিকৃত বলিয়া মনে করেন। 'মনে করেন' মাত্র, মনে করাটা অবিদ্যা, মায়া; তিনি প্রকৃতপক্ষে নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, অবিকৃতই থাকেন। এখানেই মায়াবাদের উৎপত্তি। মায়াবাদ সাংখ্যদর্শন হইতে উৎপন্ন হইয়া বৌদ্ধমতে প্রবেশ করে এবং প্রধানতঃ বৌদ্ধমতের ভিতর দিয়াই আধুনিক বেদান্তমতে সঞ্চারিত হয়। পাঠক 'ছান্দোগ্য' উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে উদ্দালক আরুণির সৃষ্টিতত্ত্ব পাঠ করিলে দেখিবেন আরুণির মতে জ্ঞান ও ইচ্ছাযুক্ত 'সৎ' বস্তু হইতে 'তেজ' 'অপ্' ও 'অন্ন' এবং তাহাদের মিশ্রণে জগতের সমস্ত বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে। সাংখ্য সম্ভবতঃ এখান হইতেই তাঁর সৃষ্টিতত্ত্বের ইঙ্গিত পান। সাংখ্যের 'সত্ত্ব', 'রজ' ও 'তম' এই মূল গুণত্রয় আরুণির 'তেজ' 'অপ্' ও 'অন্নের' নামান্তর মাত্র। কিন্তু আরুণি অদ্বৈতবাদী, তিনি তাঁহার 'সৎ'কেই সমস্ত সৃষ্টির একমাত্র কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাংখ্য লৌকিক দ্বৈতবাদের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই, তাঁহার দর্শনে অচেতন বস্তুর স্থান থাকা চাই, তাই তিনি তাঁহার পুরুষের কাছে প্রকৃতিকে রাখিয়াছেন এবং উভয়ের মিলনে—প্রকৃত মিলন নহে, মায়িক মিলনে,—

জগতের বিচিত্রতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জগতের বস্তুসমূহ, —যাহা বস্তু বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মূলবস্তুদ্বয়ের বিকারমাত্র—ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বে অর্থাৎ শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম বিকার বুদ্ধি বা মহৎতত্ত্ব অর্থাৎ এমন জ্ঞান যাহা বিষয়-বিষয়িতে বিভক্ত হয় নাই, কিন্তু হইবার উন্মুখী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিকার অহঙ্কার অর্থাৎ 'আমি'বোধ এবং পঞ্চতন্মাত্রা অর্থাৎ স্থূল পঞ্চভূতের সূক্ষ্ম আকার। তৎপরে আসিল পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়,—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্; পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়,—বাক্, হস্ত, পাদ, মলনির্গমের ইন্দ্রিয় ও জননেন্দ্রিয়, এবং মন, যাহা দশেন্দ্রিয়ের মূল বা সমষ্টি। সর্ব্বশেষ বিকার পঞ্চ মহাভূত অর্থাৎ মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ। এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব মনে রাখিবার ইঙ্গিত এই যে তন্মাত্রা, মহাভূত এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রত্যেকে পাঁচটা পাঁচটা করিয়া কুড়িটা, এবং তার উপর আর তিনটা—বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন।

পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব

সাংখ্যমতে পুরুষ বহু, কিন্তু প্রকৃতি এক। একই প্রকৃতির সংশ্রবে আসিয়া বহু পুরুষ বদ্ধ হয়। এই সংশ্রব কিন্তু ছাড়ান যায়। প্রকৃতি-পুরুষের ভেদ-করণ-রূপ তত্ত্বজ্ঞান এবং যম-নিয়মাদি ও ধারণাধ্যানাদি সাধন অবলম্বন করিলে প্রত্যেক পুরুষ প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া 'কৈবল্য' অর্থাৎ নিজের 'কেবল' অর্থাৎ একক স্বরূপ লাভ করিতে পারে। পাঠক দেখিবেন, সাংখ্যমতে ঈশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টি-

কর্ত্তার কোন স্থান নাই। উচ্চ নীচ, নানা শ্রেণীর পুরুষ আছেন, কিন্তু কাহারোই কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, কর্ত্তৃত্ব কেবল প্রকৃতির। পুরুষের কল্পিত কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতির বিকার, তাহা ছাড়িবার বস্তু, রাখিবার বস্তু নহে। কিন্তু কোন কোন সাংখ্যবাদী ঈশ্বরবাদের আকর্ষণ এড়াইতে পারেন নাই, নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনেও প্রকারান্তরে ঈশ্বরবাদ আনিয়া ফেলিয়াছেন। কাজেই সাংখ্যদর্শন দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে,—(১) কাপিল বা নিরীশ্বর সাংখ্য, (২) পাতঞ্জল বা সেশ্বর সাংখ্য। পতঞ্জলি কপিলের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন, সেখানে তিনি ঈশ্বরের কোন স্থান রাখেন নাই। কিন্তু সাধনবিভাগে তিনি এক জন 'ঈশ্বর' আনিয়া ফেলিয়াছেন। সেই 'ঈশ্বর' জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, নিয়ন্তাও নহেন। তিনি জীবাত্মার অন্তরাত্মাও নহেন। কিন্তু তিনি নিত্য-বুদ্ধ মুক্তস্বভাব পরম পুরুষ, আমাদের আদর্শ। তিনি কপিলরূপে অবতীর্ণ হইয়া সাংখ্যদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং বিদেহ অবস্থায়ও তিনি আমাদের সাধনের সহায়। কৈবল্য লাভের চেষ্টায় তাঁহাতে 'প্রণিধান' বা মনঃসংযোগ করিলে এবং তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলে তাঁহার আনুকূল্য লাভ করা যায়। যাহা হউক্, পতঞ্জলির তথাকথিত ঈশ্বরবাদ মূল সাংখ্যদর্শনকে এবং বেদান্তদর্শনকে বিশেষ প্রভাবিত করিতে পারে নাই। তাঁহার বিশেষ কার্য্য 'যোগদর্শন',—

নিরীশ্বর ও সেশ্বর সাংখ্য

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি,—এই অষ্টাঙ্গ যোগের ব্যাখ্যা। এই সমস্ত সাধনই বৈদিক সাধনপ্রণালী হইতে গৃহীত। কিন্তু তাঁহার সাধনাঙ্গের শ্রেণীবিভাগ বেদের পরবর্ত্তী বৈদান্তিক সাহিত্যে স্থূলরূপে গৃহীত এবং নানা ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ভারতীয় সাহিত্যে সাংখ্যপ্রভাব

সাংখ্যদর্শন, বিশেষতঃ কাপিল সাংখ্য, বেদের পরবর্ত্তী ভারতীয় সর্ব্বপ্রকার সাহিত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। ইহা সূত্র, স্মৃতি, কাব্য, পুরাণ, তন্ত্র, সর্ব্বপ্রকার সাহিত্যে সূক্ষ্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহার মূল কারণ সাংখ্যদর্শনের আপাত-যৌক্তিকতা। আমাদের জ্ঞান যত দূর যায়, তাহাতে বোধ হয় বৈদান্তিকেরা ইহার দ্বৈতবাদ যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিতে পারেন নাই, কেবল ইহার অশাস্ত্রিকতা দেখাইতে পারিয়াছেন। ইহার দ্বৈতবাদ খণ্ডন করিতে না পারিয়া এই দ্বৈতবাদের সহিত তাঁহাদের অদ্বৈতবাদের সন্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টা সর্ব্বত্রই বিফল হইয়াছে। চেষ্টার অবান্তর ফল হইয়াছে এই যে উপনিষদের বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদ তাঁহাদের হাতে মলিন হইয়া গিয়াছে, 'পদ্মপুরাণের' ভাষায় "প্রচ্ছন্নম্ বৌদ্ধম্" হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা সাংখ্যের প্রকৃতিকে ব্রহ্মের মায়াশক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্ম যদি নিষ্ক্রিয় হন তবে তাঁহার কোন প্রকার শক্তি বা কর্ত্তৃত্ব থাকা কিরূপে

সম্ভব ? নিষ্ক্রিয়ের শক্তি বা কর্ত্তৃত্ব কাল্পনিক ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। ব্রহ্মের শক্তি কাল্পনিক হইলে উহার অভিব্যক্তি জগৎ এবং জীবও কাল্পনিক। জীব এবং জীবের সাধনক্ষেত্র জগৎ কাল্পনিক হইলে সমস্ত সাধন-শাস্ত্রই মিথ্যা হইয়া যায় এবং ব্রহ্মও সমুদায় কল্যাণগুণ-বৰ্জ্জিত হইয়া শূন্য বা উপেক্ষণীয় বস্তুতে পরিণত হন। সাংখ্যের সহিত বেদান্তের মিলনের এই কুফল আমরা 'ভগবদ্গীতা' ও 'ব্রহ্মসূত্র' ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বিশেষ ভাবে দেখাইব। এই অধ্যায়ে কেবল শ্বেতাশ্বতরের উপর সাংখ্যপ্রভাব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিব।

শ্বেতাশ্বতরে সাংখ্যপ্রভাব

'শ্বেতাশ্বতরে' সাংখ্য দ্বৈতবাদের প্রভাব এবং এই দ্বৈত-বাদকে বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের সহিত মিলাইবার বিফল চেষ্টা উহার প্রথমাধ্যায়েই স্পষ্ট দেখা যায়। অন্য সমুদায় কারণবাদ বর্জ্জন করিয়া শ্বেতাশ্ব-তর 'দেবাত্মশক্তি'কেই জগতের কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের ভোগ্য বস্তুসমূহের মধ্যে একটা অনাত্ম কারণের ধারণা,—যাহা তিনি সাংখ্য হইতে পাইয়াছেন,—তাহা তিনি পরিত্যাগ করিতে পারি-তেছেন না। সেই কারণ যে ব্রহ্মেরই অন্তর্ভূত, তাহা তিনি এস্থলে এবং অন্য স্থলে বারবারই বলিয়াছেন। কিন্তু তাহাই যদি হইল, তবে সেই কারণকে 'চক্র', 'পাশ', 'জাল', ভীষণ আবর্ত্তময়ী নদী, এরূপ ভাবে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন

কি? ইহাকে পরিত্যাগ করাতেই মুক্তি, এরূপ বলিবারই বা সার্থকতা কি? কিন্তু এই উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে এবং অন্যত্র নানা স্থানে জগৎকে এরূপই বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মকে বলা হইয়াছে 'বিশ্বরূপ' (১।৯), আবার পরের শ্লোকেই বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মযোগ-সাধনদ্বারা 'বিশ্বমায়া' নিবৃত্ত হয়,—"ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়া-নিবৃত্তিঃ"। তাঁহাকে সর্ব্বত্রই জগৎকার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাঁহার বিবিধ শক্তি স্বীকার করা হইয়াছে—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে (৬।৮)",—অথচ স্থানে স্থানে তাঁহাকে বলা হইয়াছে 'অকর্ত্তা' (১।৯), 'নির্গুণ' (৬।১১), 'নিষ্ক্রিয়' (৬।১৯)। সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতির নামান্তর 'প্রধান'। শ্বেতাশ্বতর সেই শব্দটী ব্যবহার করিয়া বলিয়াছেন,—

"যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ।
স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ।"

—"যে অদ্বিতীয় দেবতা ঊর্ণনাভের ন্যায় স্বভাবতঃ প্রধান-জাত তন্তুসমূহদ্বারা আপনাকে আচ্ছাদন করিয়াছেন (৬।১০)। ঊর্ণনাভের দৃষ্টান্ত অন্য উপনিষদেও আছে, কিন্তু তাহাতে সাংখ্য পারিভাষিক শব্দ 'প্রধান' ব্যবহার করা হয় নাই, সুতরাং দ্বৈতবাদের কোন গন্ধ নাই। শ্বেতাশ্বতর 'প্রধান' শব্দ ব্যবহার করিয়া এবং জগৎকে 'প্রধানজ তন্তু' বলিয়া দেখাইতেছেন যে তিনি জগৎকে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলাইতে

পারিতেছেন না, অথচ তিনি নানা স্থানেই বলিতেছেন যে জগৎ ব্রহ্মেরই অন্তর্ভূত, যথা,—

"ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ" (১।৯)

"ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।" (১।১২)

সাংখ্য-বেদান্তের সামঞ্জস্য করা কত দূর অসম্ভব, তাহা পাঠক কতকটা দেখিলেন, পরে আরো দেখিবেন। ব্রহ্মের সহিত জগৎকে এক বলা অথচ জগৎকে ঘৃণার সহিত ছাড়িতে বলা —ছাড়াতেই মুক্তি, এই কথা বলা,—স্পষ্টতঃই স্ববিরোধী। শ্বেতাশ্বতর শিবের ভক্ত, অথচ শিবের সৃষ্ট এই জগৎ তাঁহার কাছে অশিব, ঘৃণনীয়, হেয়। এই অমঙ্গলবাদ পরবর্ত্তী মায়াবাদের সাহিত্যে আরও স্পষ্ট ও প্রবল। যাহা হউক্, পরবর্ত্তী বৈদান্তিক মায়াবাদে যে নিরীশ্বরতার ঝোঁক্ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা শ্বেতাশ্বতরে নাই। তিনি সর্ব্বত্রই ব্রহ্মকে ব্যক্তিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী মায়াবাদের সাহিত্যে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের মধ্যে স্পষ্ট প্রভেদ করা হইয়াছে, সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে ব্যাবহারিক অর্থাৎ আপেক্ষিক সত্য এবং নির্গুণ ব্রহ্মকে পারমার্থিক অর্থাৎ নিরপেক্ষ বা একান্ত সত্য বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরে এই প্রভেদ নাই, অথবা শ্বেতশ্বতরের 'কপিল' থাকিলেও তাহা অস্পষ্ট। আর একটী বিষয়ে পরবর্ত্তী বৈদান্তিক সাহিত্যের সহিত, এমন কি সাংখ্য সাহিত্যের সহিতও, শ্বেতাশ্বতরের প্রভেদ আছে। শ্বেতাশ্বতর

বিশ্বশরীর হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মাকে পরব্রহ্মের প্রথমজ সন্তান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহাকেই 'কপিল' বলিয়াছেন। 'কপিল' অর্থ পিঙ্গল বা স্বর্ণবর্ণ অর্থাৎ জ্ঞানজ্যোতিসম্পন্ন। তাঁহার মতে কপিলই প্রথমে পরব্রহ্ম হইতে বেদ অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করেন। জীবমাত্রই হিরণ্যগর্ভের অংশ এবং তাঁহার জ্ঞানভাগী। শ্বেতাশ্বতরের এই মত দেখিয়া মনে হয় তাঁহার সময়ে কপিলের ঐতিহাসিকত্ব,—তিনি যে অন্য দার্শনিকদের মত এক জন মানব দার্শনিক, এই মত,—চলিত হয় নাই। যাহা হউক্, আমরা কপিল সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতরের কয়েকটী উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। তৃতীয়াধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে 'রুদ্র'কে দেবতাদের জন্মদাতারূপে উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেছেন, "হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বম্"—'যিনি প্রথমে হিরণ্যগর্ভকে উৎপাদন করিয়াছিলেন।" চতুর্থাধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোকে বলিয়াছেন, "হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানম্",—"হিরণ্যগর্ভকে জন্মিতে দেখিয়াছেন।" পঞ্চমাধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে, "ঋষিং প্রসূতং কপিলম্ যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ",—"যিনি সকলের অগ্রে প্রসূত ঋষি কপিলকে জ্ঞানদ্বারা পোষণ করিয়াছিলেন এবং জন্মিতে দেখিয়াছিলেন।" ষষ্ঠাধ্যায়ে ১৮শ শ্লোকে,—"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।" —"যিনি প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন এবং তাঁহাকে বেদসমূহ প্রদান করেন ”

দ্বাদশ প্রধান উপনিষদের মধ্যে কেবল শ্বেতাশ্বতরেই আমরা ভক্তি শব্দের উল্লেখ দেখি,—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ" (৬।২৩), তাহাতেই বোধ হয় আমরা পৌরাণিক যুগের অতি নিকটে আসিয়াছি। 'ভগবদ্গীতায়' আমরা একেবারে পৌরাণিক সময়ে আসিয়া পড়ি। এখন 'গীতা'র আলোচনায়ই আমরা প্রবৃত্ত হইব।

শ্বেতাশ্বতরে 'ভক্তি'

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

অবতারবাদ

উপনিষদে চলিত অবতারবাদ নাই, কিন্তু অবতারবাদের আভাস বা বীজ আছে। আমাদের উপনিষদ্-ব্যাখ্যায় পাঠক তাহা দেখিয়া থাকিবেন। উপনিষদের মতে জগৎ ও জীব উভয়ই ব্রহ্মের প্রকাশ,—দেশ কালে অভিব্যক্তি, সুতরাং—আংশিক প্রকাশ। এই প্রকাশকে যদি 'অবতার' বলা যায় তবে উপনিষদ্ অবতারবাদিনী। গীতা এবং বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন পুরাণে অবতারবাদের এই ব্যাখ্যাই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এসকল গ্রন্থে আর এক প্রকার অবতারবাদেরও আভাস আছে এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রভৃতি আধুনিক পুরাণে সেই আভাস বিশেষরূপে ফুটিয়াছে। উপনিষদের অবতারবাদকে 'সাধারণ অবতারবাদ' বলা যায়। এই মতে জীব মাত্রই ব্রহ্মের অবতার। জীবে জ্ঞানৈশ্বর্য্যের তারতম্য আছে, তদনুসারে তাহার অবতারত্বেরও তারতম্য হয়। কোন জীবে ব্রহ্মপ্রকাশ অধিক, কোন জীবে অল্প। কিন্তু এই 'সাধারণ অবতারবাদ' ছাড়া আর একটী অবতারবাদ আছে যাহা বৈদিক গ্রন্থে নাই, কেবল পৌরাণিক গ্রন্থেই দেখা যায়। এই অবতারবাদকে বলা যায় 'বিশেষ অবতারবাদ'। এই অবতারবাদ সাধারণ জীবে ব্রহ্মের

অবতারবাদ—সাধারণ ও বিশেষ

প্রকাশ দেখে না, অথবা দেখিলেও সাময়িক ও অসাক্ষাৎভাবে দেখে। ইহা বিশেষ দেশে, বিশেষ কালে, বিশেষ প্রয়োজনে ব্রহ্মকে অবতীর্ণ,—পূর্ণভাবে অবতীর্ণ—বলিয়া বিশ্বাস করে। গীতার নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে এই বিশেষ অবতারবাদের কথাই বলা হইয়াছে,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম্ অধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

—"হে ভারত, যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয় এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, পাপীদের বিনাশের জন্য, এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।" (৪।৭,৮)

'ভাগবত'কার তাঁহার গ্রন্থের অন্যত্র সাধারণ অবতারবাদ শিক্ষা দিয়াছেন বটে, কিন্তু "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" (১।৩।২৮) এই বাক্যে বিশেষাবতারবাদই স্বীকার করিতেছেন। এরূপ অবতারবাদ উপনিষদের কুত্রাপি নাই। 'কৌষীতকি'র তৃতীয়াধ্যায়ে ইন্দ্র যে ব্রহ্মের সহিত একত্ব দাবি করিয়াছেন তাহা সাধারণ অর্থেই। ব্রহ্মের সহিত একতাবোধ উজ্জ্বল হইলে তাঁহার মতে প্রত্যেক জীবই এরূপ অবতারত্বের দাবি করিতে পারে। "ব্রহ্মসূত্রে" (১।১।৩০) এই কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু এরূপ সাধকেরও ব্রহ্মানুভূতি যখন অনু-

জ্জ্বল হইয়া যায় তখন অবতারত্বের দাবি অন্যায়। মহা-ভারতের 'অনুগীতায়' কৃষ্ণ ভগবদ্গীতোক্ত উপদেশ পুনরাবৃত্তি করিতে অসম্মত হইয়াছেন, কারণ যে যোগের অবস্থায় সেই উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তখন তিনি সেই যোগের অবস্থা হারাইয়াছেন। যোগদৃষ্টি যতই উজ্জ্বল হউক্ না কেন, জীব-ব্রহ্মের ভেদ কখনও যায় না, জীব কখনও ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তা লাভ করে না। সুতরাং আমাদের মতে উচ্চতম যোগের অবস্থায়ও জীবের পক্ষে ব্রহ্মত্ব দাবি করা এবং ব্রহ্মপদবীতে দাঁড়াইয়া কথা বলা উচিত নহে। আমাদের আরো মনে হয় যে বিশেষ অবতারবাদ বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদের বিরোধী। বেদান্তমতে ব্রহ্ম দেশকালের আশ্রয় হইয়াও দেশ-কালের অতীত। ফলতঃ দেশ-কালের অতীত না হইলে দেশ-কালের আশ্রয় হওয়া যায় না। যাহার জ্ঞানশক্তি দেশ-কালে সীমাবদ্ধ সে সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের আশ্রয় হইতে পারে না। যে দেশ-কালে আবদ্ধ শরীরধারী, চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত যাহার জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে না, হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহায়তা ভিন্ন যাহার কর্ম্ম করা অসম্ভব, তাহাকে কখনও ব্রহ্মের অবতার, বিশেষতঃ ব্রহ্মের পূর্ণাবতার, বলা যায় না। সুতরাং ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক রাম, কৃষ্ণ, যিশু প্রভৃতিকে কখনও বিশেষ অর্থে ব্রহ্মের অবতার বলা যায় না। দেশাতীত, কালাতীত অনন্ত ব্রহ্ম দেশ-কালের সীমায় আবদ্ধ হন, ইহা

স্ববিরোধী কথা। হিন্দু বা খ্রীষ্টীয় পুরাণে এরূপ অবতারের বর্ণনায় নানা বিরুদ্ধ ভাব দেখা যায়। 'ভগবদ্গীতা' ও 'অনুগীতা'র পরস্পর বিরোধের দৃষ্টান্ত ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 'ভগবদ্গীতার' কৃষ্ণ ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম, 'অনু-গীতার' কৃষ্ণ সাধকমাত্র। যাহা হউক্, এখন বিশেষ ভাবে 'ভগবদ্গীতার' অবতারবাদ আলোচনা করা যাক্।

ভগবদ্গীতার অবতারবাদ

ভগবদ্গীতাকার সম্ভবতঃ মহাভারতের কৃষ্ণকে বিশেষ অর্থে ব্রহ্মের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু তিনি বিশেষ অবতারবাদের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ অবতারবাদও স্বীকার করেন, ব্রহ্মকে জগতে এবং প্রত্যেক জীবাত্মাতে প্রকাশিত বলিয়া বিশ্বাস করেন। এবিষয়ে তিনি সম্পূর্ণরূপেই বৈদান্তিক। তাঁহার ব্রহ্মবাদ মূলে উপনিষদেরই ব্রহ্মবাদ। তাঁহার কৃষ্ণ ঔপনিষদ্ ব্রহ্ম-বাদেরই ব্যাখ্যাকার। "সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।" তিনি ষষ্ঠাধ্যায়ে অর্জ্জুনকে নিজ আত্মাকেই ব্রহ্মরূপে দেখিতে বলিয়াছেন এবং একাদশ অধ্যায়ে ব্রহ্মকে বিশ্বরূপে দেখিতে উপদেশ দিয়াছেন। ব্রহ্মদর্শন সম্বন্ধে তাঁহার এই ঔপনিষদ্ মত ও সাধন থাকাতেই তাঁহার পক্ষে গীতা লেখা সম্ভব হইয়াছে এবং এই কারণেই তাঁহার গীতা সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ না হইয়া সকল দেশে, সকল কালে, সর্ব্ব সাধারণের উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সম্ভবতঃ তিনি মহাভারতের কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক

পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এমন কি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথী হইয়া যুদ্ধারম্ভে তাঁহাকে কিছু উপদেশ দিয়াছিলেন, এই কথাকেও হয়ত তিনি ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া মানিতেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে গীতার ন্যায় দীর্ঘ ও বিচিত্র বিষয়পূর্ণ উপদেশ তো কখনও সম্ভব নহে এবং সম্ভব হইলেও তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করিবার লোক কোথায়? গীতার বিবরণ নিশ্চয়ই কাব্য, কল্পনা-সম্ভূত। কিন্তু গীতাকারের ন্যায় উচ্চ সাধক কিরূপে তাঁহার উপাস্য সম্বন্ধে এরূপ কল্পনার প্রশ্রয় দিলেন? এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর এই যে তাঁহার কল্পনা সাধারণ কবির কল্পনা নহে, তাঁহার কল্পনা সাক্ষাৎ জ্ঞানের অবিরোধী কল্পনা। তাঁহার 'কৃষ্ণ' কেবল কাব্যের কৃষ্ণ নহেন, তিনি ঔপনিষদ্ ব্রহ্মের নামান্তর মাত্র। তিনি জীবের জীবনরথের সারথী হইয়া, ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগুলির রাশ ধরিয়া, জীবকে গম্যস্থানে লইয়া যাইতেছেন। গীতাকার এবং তৎপূর্ব্বে মহাভারতের আদি কবিগণ কঠোপনিষদের তৃতীয় বল্লীতে তাঁহার দেখা পাইয়া থাকিবেন, জীবনের অভিজ্ঞতা-ক্ষেত্রের তো কথাই নাই। গীতাকারের 'অর্জ্জুন'ও কেবল কাব্যের অর্জ্জুন নহেন, তিনি জীবাত্মার নামান্তর মাত্র; এবং তাঁহার কুরুক্ষেত্র এবং তত্রত্য যুদ্ধও কেবল বিশেষ কোন স্থান নহে এবং বিশেষ কোন যুদ্ধ নহে। আমাদের জীবনক্ষেত্রে প্রত্যহ, প্রতিমুহূর্ত্তে, যে শ্রেয় ও প্রেয়ের যুদ্ধ চলিতেছে, তিনি সেই ক্ষেত্র ও সেই যুদ্ধের

কথাই কাব্যের ভাষায় বলিয়াছেন। সেই ক্ষেত্রে এবং সেই যুদ্ধ সম্বন্ধে পরমাত্মা আমাদিগকে প্রতিনিয়ত সাক্ষাৎ-ভাবে যে উপদেশ দেন, তাহাই প্রকৃত ভগবদ্গীতা। গীতা-কার যোগস্থ হইয়া সেই উপদেশ শুনিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহাই ভারতযুদ্ধের আখ্যায়িকার সঙ্গে যুক্ত করিয়া অপূর্ব্ব রূপকের সৃষ্টি করিয়াছেন। এস্থলেই তাঁহার কবিত্ব ও কল্পনা। এই কবিত্ব ও কল্পনাতে অসংখ্য লোকের নিকট গীতা মনোজ্ঞ ও আদরণীয় হইয়াছে। যাঁহারা মহাভারতের গল্পকে ঐতিহাসিক বলিয়া বিশ্বাস করেন না, অথচ গীতার রূপকের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষেও এই রূপক বিশেষ কার্য্যকর হয়। সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মশ্রবণ-মূলক এই রূপকের সাহায্যে আধ্যাত্মিক সত্য শুষ্ক চিন্তামাত্র না থাকিয়া তাঁহাদের কাছে জীবন্ত গুরুশিষ্যের সংবাদরূপে প্রতিভাত হয়। উপনিষদ্ এবং গীতা, বৈদিক গ্রন্থ ও বেদমূলক পৌরাণিক গ্রন্থের সাধারণ প্রভেদ এ-স্থলে। যাহা হউক্, গীতাকার যে তাঁহার গ্রন্থের সকল স্থলে তাঁহার উপদিষ্ট সাক্ষাৎ ব্রহ্মযোগের আদর্শ বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না, বরঞ্চ আমাদের মনে হয় অনেক স্থলেই তাঁহার সাক্ষাৎ জ্ঞানলব্ধ সত্যের সঙ্গে দেশ-কাল ও পরম্পরাগত সংস্কার-সুলভ মত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই মিশ্রণ ধরিতে গেলেও ঔপনিষদ্ ঋষিদের এবং তাঁহার নিজ-প্রদর্শিত সাক্ষাৎ

যোগের পথই ধরিয়া থাকিতে হইবে, আত্মদর্শন-বিহীন বহি-দৃষ্টিতে, গভীর সাধনবর্জ্জিত স্থূল বিচারে, অধ্যাত্ম জগতের সত্যাসত্যের ভেদ বোঝা সম্ভব নহে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

কর্ম্মযোগ

গীতার কোন কোন ব্যাখ্যাকার উহার আঠারটী অধ্যায়কে তিনটী ষট্‌কে অর্থাৎ ষড়াধ্যায়ে বিভক্ত করেন। প্রথম ষট্‌ককে তাঁহারা বলেন 'কর্ম্ম-ষট্‌ক', দ্বিতীয় ষট্‌ককে 'ভক্তি-ষট্‌ক' বা 'উপাসনা-ষট্‌ক' এবং তৃতীয় ষট্‌ককে 'জ্ঞান-ষট্‌ক'।

ভগবদ্গীতায় ষট্‌ক-ভেদ

সূক্ষ্ম ভাবে দেখিতে গেলে এই বিভাগ ভুল। প্রত্যেক বিভাগেই জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, এই তিন প্রকার সাধনের কথাই অবিভক্ত ভাবে বলা হইয়াছে। এরূপ না বলিলে চলিত না; কারণ জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম পরস্পর-সাপেক্ষ, ইহাদের মধ্যে একান্ত ভেদ নাই। কিন্তু স্থূল ভাবে বিভাগটা স্বীকার করা যায়। বলা যায় যে প্রথম ষট্‌কে কর্ম্মের কথা বেশী, দ্বিতীয় ষট্‌কে ভক্তির কথা বেশী এবং তৃতীয় ষট্‌কে জ্ঞানের কথা বেশী। আমরা স্থূল ভাবে বিভাগটা স্বীকার করিয়া গীতাকারের কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের উপদেশ ব্যাখ্যা করিব। তাঁহার মতে কর্ম্মদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে ভক্তি সাধন সুগম হয়, এবং ভক্তিসঞ্চার হইলেই সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়। চিত্তশুদ্ধি ও ভক্তিসঞ্চারের পূর্ব্বে যে জ্ঞান থাকে, যাহা না থাকিলে কোন সাধনই সম্ভব হয় না, তাহা

পরোক্ষ জ্ঞান,—শ্রুতিমূলক বিশ্বাস বা তরল যুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত। যাহা হউক্, আমরা এখন গীতার প্রথম ষট্‌কের ভিতর প্রবেশ করিতে চেষ্টা করি। কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কর্ম্ম-ষট্‌ক

দুর্য্যোধন বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবদের পৈতৃক রাজ্যের সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও প্রত্যর্পণ করিবেন না। অথচ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রাজ্য ছাড়াও অন্যায়। সুতরাং এই যুদ্ধ ধর্ম্ম্য যুদ্ধ। ভগবানকে সারথী করিয়া অর্জ্জুন এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু উভয় পক্ষে আত্মীয় কুটুম্ব দেখিয়া অর্জ্জুন বিষাদযুক্ত হইলেন এবং যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিলেন। এই 'হৃদয়-দৌর্ব্বল্য' অতি সাধারণ ব্যাপার। কঠোর কর্ত্তব্য করিতে অনেক লোকই কুণ্ঠিত হয়। স্বজনকে কষ্ট দিবার এবং তাঁহাদের নিকট নিন্দনীয় হইবার ভয়ে বিবেককর্ণে শ্রুত ভগবানের আদেশও লঙ্ঘন করে। নিজের ভীরুতা ও দুর্ব্বলতাকে কুযুক্তি দ্বারা সমর্থন করে। অর্জ্জুন তাহাই করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহার সমুদয় কুতর্ক খণ্ডন করিলেন। তিনি দেখাইলেন ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণদান ও মনুষ্যবধ পাপ নহে। মৃত্যুতে মানুষের শরীরমাত্র নষ্ট হয়, আত্মা জন্ম-মৃত্যুর অতীত, তাহার বিনাশ নাই। সমৃদ্ধ রাজ্যপ্রাপ্তির লোভ দেখাইলেন, বীর পুরুষের পক্ষে যুদ্ধ না করা যশ ও স্বর্গ-প্রাপ্তি উভয়ের প্রতিবন্ধক, কাপুরুষতার নিন্দা অপেক্ষা মরণ শ্রেয়, ইত্যাদি নিম্ন স্তরের অনেক যুক্তি প্রয়োগ করিলেন।

যখন দেখিলেন এসকল যুক্তি অর্জ্জুনের মন পরিবর্ত্তন করিতে পারিল না, তখন উচ্চ স্তরের যুক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। সেই যুক্তির উদ্দেশ্য কর্ম্মযোগের ধর্ম্ম স্থাপন করা। এই কর্ম্মযোগই এই ষট্‌কের প্রধান বিষয়। এক অর্থে বলা যায় যে ইহাই সমগ্র গীতার উপদিষ্ট বিষয়। যাহা হউক্, এই যোগের কথা বলিতে যাইয়া গীতাকার

কর্ম্মযোগের বিপক্ষদ্বয়

দুটী পরস্পর-বিরুদ্ধ সম্প্রদায়কে সম্মুখে রাখিয়াছেন এবং তাহাদের মত খণ্ডন করিয়া তাঁহার নিজ মত স্থাপন করিয়াছেন। এই কর্ম্ম-যোগের ধর্ম্ম উপনিষদেও উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সেখানে ইহা তেমন ফুটে নাই; গীতাকার ইহাকে স্পষ্ট ও দৃঢ়রূপে স্থাপন কবিয়াছেন। বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগের যজ্ঞাদি কর্ম্ম উপনিষদের নানা স্থানে নিম্নাঙ্গের ধর্ম্ম বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। উহা জ্ঞান-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম নহে, এবং উহার ফল অস্থায়ী; এই জন্যই উহা নিন্দনীয়। ঔপনিষদ্ ঋষিগণ ইহা পরিত্যাগ করেন নাই, কিন্তু ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্ম স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেধর্ম্মই এই গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হইতেছে। উপনিষদের সময়ে কর্ম্ম ও জ্ঞানের যে সন্ধি চলিয়াছিল, পরবর্ত্তী সময়ে সেই সন্ধি ভাঙ্গিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। সাংখ্যবাদীরা শাস্ত্রের প্রামাণ্য সাধারণভাবে স্বীকার করিয়াও শ্রৌত স্মার্ত্ত সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক জ্ঞানমাত্র সাধনের উপদেশ দিতে লাগিলেন। বৌদ্ধেরা

এই পথে আরো অগ্রসর হইয়া সর্ব্বপ্রকার বৈদিক ধর্ম্ম,—কর্ম্মকাণ্ডের যজ্ঞাদি এবং জ্ঞানকাণ্ডের ব্রহ্মোপাসনা—পরিত্যাগ করিলেন। গীতাকার এই বিরোধ ও বিপ্লবের মধ্যে রক্ষণশীল সংস্কারকের পথ অবলম্বন করিলেন। যাঁহারা বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম্মের এত দূর পক্ষপাতী যে তাহা অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্ম স্বীকারই করেন না, তিনি তাঁহাদের বিপক্ষ হইয়া উপনিষদুক্ত জ্ঞানপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা দেখাইলেন। অপর দিকে তিনি কর্ম্মবিরোধী সাংখ্য ও বৌদ্ধদিগকে এক শ্রেণীতে ফেলিয়া কর্ম্মের একান্ত আবশ্যকতা দেখাইলেন। তিনি বৌদ্ধদের নাম করেন নাই, কিন্তু তাঁহার উপর বৌদ্ধ-প্রভাব এবং বৌদ্ধমত সম্বন্ধে তাঁহার বিরুদ্ধ ভাব, উভয়ই স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার 'যজ্ঞ' অর্থাৎ পূজার বিরোধী, তাঁহাদের উপর যে তাঁহার তীব্র কটাক্ষ, তাহা বৌদ্ধদের জন্য অভিপ্রেত বলিয়াই বোধ হয়। অপর দিকে 'লোকসংগ্রহে'র দিকে, 'সর্ব্বভূত-হিতে রত' থাকার দিকে, তাঁহার যে প্রবল ঝোঁক্, তাহা বৌদ্ধানুকরণের ফল বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক্, এখন তাঁহার কর্ম্মযোগ বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্। কর্ম্মযোগ শুধু কর্ম্ম করা নহে। যেমন তেমন করিয়া, যে কোন ভাব লইয়া, কতকগুলি কর্ম্ম করিলেই কর্ম্মযোগ-সাধন হয় না। যোগবিহীন হইয়া কর্ম্ম করিলেও সেকর্ম্ম অল্পাধিক পরিমাণে লোকের হিতকর হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কর্ত্তার হিত হওয়া দূরে থাক্, বরঞ্চ ঘোর

অহিত হইতে পারে এবং সেই অহিতের ফল পার্শ্ববর্ত্তীদের উপর অল্পাধিক পরিমাণে বর্ত্তাইতে পারে। বর্ত্তমান অতিব্যস্ততার দিনে অনেক বিজ্ঞ লোকও একথা ভুলিয়া যান। এই জন্য গীতার কর্ম্মযোগের উপদেশ বর্ত্তমান সময়ের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। গীতাকার কর্ম্মযোগের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দিয়াছেন,—"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"। কর্ম্ম এমন ভাবে করিতে হইবে যাহাতে কর্ম্মের সুফলটা হয়, কুফলটা না হয়।

নিষ্কাম কর্ম্ম

কর্ম্মের একটী বন্ধনী শক্তি আছে, উহাকেই গীতাকার বিশেষ ভাবে কর্ম্মের কুফল মনে করেন এবং সেই কুফলটা এড়াইবার জন্যই তাঁহার বিশেষ চেষ্টা। যে বস্তু পাবার কামনা লইয়া কর্ম্ম করা যায় সেবস্তুর প্রাপ্তিতে, এমন কি অপ্রাপ্তিতেও, সেবস্তুর কামনা বাড়িয়া যায়। সেবস্তু পাইলে তার প্রতি গাঢ় হইতে গাঢ়তর 'রাগ' বা আসক্তি জন্মে, না পাইলে না-পাওয়ার উপর অথবা না-পাওয়ার কারণের উপর 'দ্বেষ' বা ক্রোধ জন্মে। 'রাগ-দ্বেষ' একটা ভাবেরই দুটা দিক্‌মাত্র। রাগ-দ্বেষের অধীন থাকাই বন্ধন। সেই জন্য গীতাকারের উপদেশ এই যে রাগ-দ্বেষের অধীন না হইয়া, অনাসক্ত নিষ্কাম হইয়া, কর্ম্ম করিতে হইবে। 'কাম' অর্থাৎ আসক্তিকেই তিনি মুক্তিপথের প্রধান বা একমাত্র বাধা মনে করেন এবং নিষ্কাম কর্ম্মকেই মুক্তির প্রধান বা একমাত্র সাধন মনে করেন। কিন্তু 'কাম'ছাড়া কি কোন কর্ম্ম হয়? কাম বা ইচ্ছা না থাকিলে লোকে কেনই বা, কি

উদ্দেশ্যে, কর্ম্ম করিবে ? 'বন্ধন ছাড়িব', 'মুক্তি লাভ করিব', ইহাও তো 'কাম'। গীতাকার এ প্রশ্নটা তুলেন নাই, ইহার সন্তোষকর মীমাংসাও করেন নাই। কিন্তু মহাভারতের অন্যত্র 'কামগীতায়' এই প্রশ্ন তোলা হইয়াছে। সেখানে কাম বলিতেছেন 'আমাকে যে ছাড়িতে চায়, আমি তাহার ভিতরেও আছি'। ঠিক কথা, কাম ছাড়িবার ইচ্ছাও কাম। গীতাকার প্রকারান্তরে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কর্ম্মবন্ধন এড়াইতে গেলে কর্ম্ম ব্রহ্মে অর্পণ করিয়া, অর্থাৎ ব্রহ্মের আজ্ঞাধীন দাস হইয়া, কর্ম্ম করিতে হইবে। 'যজ্ঞার্থ', অর্থাৎ পূজার ভাবে, ঈশ্বরার্চ্চনার অঙ্গরূপে, 'স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য' (১৮।৪৬) নিজ কর্ম্মদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিবার ভাবে, কর্ম্ম করিতে হইবে। ঈশ্বরের আজ্ঞা, ঈশ্বরের ইচ্ছা, কি ? ঈশ্বরের ইচ্ছা 'লোকসংগ্রহ', জগৎরক্ষা। তাঁহার নিজের কোন অভাব নাই, সুতরাং অভাবমোচনের কামনাও নাই, তথাপি তিনি সর্ব্বদা কর্ম্মে ব্যস্ত। তিনি কর্ম্ম না করিলে জগৎ থাকে না, এবং জগতের লোকও তাঁহার অনুকরণে নিষ্কর্ম্মা হইয়া জগতের উচ্ছেদসাধনে সহায়তা করে। সুতরাং তাঁহার নিজের অভাব না থাকিলেও তাঁহাকে কর্ম্ম করিতে হয়,—জগৎরক্ষার জন্য এবং লোককে সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য,—করিতে হয়। ভগবান্ এই ভাবেই,—তদনুকরণে,—অর্জ্জুনকে এবং অর্জ্জুনের ভিতর দিয়া আমাদের সকলকে কর্ম্ম করিতে বলিতেছেন। সুতরাং শেষটায় দাঁড়াইল এই যে নিষ্কাম কর্ম্মের অর্থ একান্ত কামনা-

শূন্য কর্ম্ম নহে, ক্ষুদ্র কামনা-বৰ্জ্জিত, মহৎ কামনা-প্রণোদিত, জগতের হিতসাধনের উদ্দেশ্যে, ঈশ্বরেচ্ছার সহিত এক হইয়া, ঈশ্বরোপাসনার অঙ্গরূপে, কর্ম্ম করা। এরূপ কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি ব্যতীত হইতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানভক্তি তো অনেক লোকেরই নাই, তাহারা কিরূপে কর্ম্ম করিবে? গীতাকার বলেন যাহাদের জ্ঞানভক্তির অধিকার জন্মে নাই তাহারা কামনার অধীন হইয়াই কর্ম্ম করিবে। জ্ঞানী তাহাদের 'বুদ্ধিভেদ' জন্মাইবেন না, বরঞ্চ তাহাদের করণীয় সমুদায় কর্ম্ম করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত রাখিবেন (৩।২৬)। যজ্ঞাদি কর্ম্ম লোকে সকামভাবে এবং ভেদবুদ্ধি লইয়া করে। জ্ঞানী ঐ সকল কর্ম্মই নিষ্কাম ভাবে এবং অভেদবুদ্ধিতে করিবেন (৪।২৪)। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম তো বিশেষ বিশেষ ফললাভের জন্যই বিহিত হইয়াছিল, সেসকল ফলে যাহার স্পৃহা নাই, কোন প্রয়োজনও নাই, সে এসকল কর্ম্ম কেন করিবে? এই আপত্তি মনে করিয়াই যেন গীতাকার জ্ঞানীর পক্ষেও যজ্ঞের,—কেবল পূজার বা উপাসনার অর্থে নহে, অগ্নিসাধ্য যজ্ঞের,—কর্ত্তব্যতা দেখাইয়াছেন। এবিষয়ে তাঁহার যুক্তি এই যে দেবতারা আমাদিগকে আমাদের ভোগ্য সামগ্রী দেন, তাঁহাদের প্রদত্ত বস্তু তাঁহাদিগকে (যজ্ঞাকারে) না দিয়া ভোগ করা অকৃতজ্ঞতার কার্য্য (৩।১২)। এই যুক্তি দুটী বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত,—(১) ইন্দ্র-বরুণাদি ভিন্ন ভিন্ন

যজ্ঞের পক্ষপাতিত্ব

দেবতা আছেন, (২) তাঁহারা আমাদের নিকট দ্রব্যযজ্ঞ চান। যাঁহাদের এই দুটী বিশ্বাস নাই তাঁহাদের নিকট এই যুক্তির কোন বল নাই। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস যে কেবল বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে চলিয়া যাইতেছে তাহা নহে। বৈদিক যুগেই যাজ্ঞবল্ক্য উহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বৃহদারণ্যক তৃতীয়াধ্যায়ের নবম ব্রাহ্মণে শাকল্যের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে বৈদিক ৩৩ জন দেবতাই ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির নামান্তর মাত্র, কেহই ব্যক্তিরূপী নহেন। দার্শনিক যুগে পূর্ব্বমীমাংসাকার জৈমিনি অনুরূপ যুক্তিতেই দেববাদ অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে যজ্ঞে ঋষিদের দেবতাহ্বান কবিত্বমাত্র। যজ্ঞের ফল সম্বন্ধে ঔপনিষদ্ ঋষিদের মত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জৈমিনি দেবতা অস্বীকার করিয়াও প্রকারান্তরে যজ্ঞফলে বিশ্বাসী। ফলের জন্যই তিনি যজ্ঞ সমর্থন করেন। গীতাকারের যুক্তি তাঁহার সম্মুখে থাকিলে তিনি তাহাতে কোন সারবত্তা দেখিতেন বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক্, বিজ্ঞানালোকে বহুদেববাদে লোকের বিশ্বাস চলিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু উচ্চতর লোকে উন্নত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে। এরূপ উন্নত আত্মাদিগকে 'দেবতা' বলাতেও বেশী লোকের আপত্তি হইবে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু এরূপ আত্মারা যে চান যে আমরা ঘৃতাক্ত ফল, শস্য, পশুমাংস, প্রভৃতি দ্রব্য অগ্নিতে অর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে সম্মান করি,

ইহা বোধ হয় আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত অতি অল্পলোকই বিশ্বাস করিবেন।

যাহা হউক্, গীতাকারের দ্রব্যযজ্ঞ-বিষয়ক উপদেশ বর্ত্তমান যুগের অনুপযোগী হইলেও তাঁহার উপদিষ্ট মূল কর্ম্ম-যোগের আদর্শ সকলেরই উপাদেয় বটে। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মযোগ সম্বন্ধীয় উপদেশের মধ্যেও তাঁহার উপর সাংখ্যের প্রভাব স্পষ্টরূপে দেখা যায়। তিনি কর্ম্মের পক্ষপাতী, সন্দেহ নাই, কিন্তু সাংখ্যকারের উপর গভীর শ্রদ্ধাবশতঃ তিনি কর্ম্মের একান্ত কর্ত্তব্যতা দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে জ্ঞানী কর্ম্ম না করিলেও মোক্ষ লাভ করিতে পারেন। যথা,

কর্ম্মযোগে সাংখ্য-প্রভাবের ফল

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদ্ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্ট স্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥
নৈব তস্য কৃতোনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥" ৩।১৭,১৮

অর্থাৎ "যে মানব আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মাতে সন্তুষ্ট, তাঁহার কর্ত্তব্য কিছু নাই। তাঁহার কর্ম্মদ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, কর্ম্ম না করিলেও কোন প্রয়োজন অসিদ্ধ হয় না। সমুদয় বস্তুর মধ্যে এমন কিছু নাই যাহা তাঁহার প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য আশ্রয় করা আবশ্যক।" অন্যত্র,

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগ্ উভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ৫।৪,৫

অর্থাৎ "অজ্ঞানীরাই সাংখ্য এবং যোগকে পৃথক্ বলে, পণ্ডিতেরা তাহা বলেন না। একটীকে সম্যক্‌রূপে অবলম্বন করিলে উভয়ের ফল পাওয়া যায়। সাংখ্যেরা যে স্থান প্রাপ্ত হন যোগীরাও তাহা প্রাপ্ত হন। যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক বলিয়া দেখেন, তিনিই ঠিক দেখেন।" এই জাতীয় কথায় গীতাকার-প্রদত্ত কর্ম্মোপদেশের বল অনেক কমিয়া যায় এবং মনে হয় যে তাঁহার মতে আত্মার চরমাবস্থায় কর্ম্মের স্থান নাই। পরবর্ত্তী আলোচনায় এই সন্দেহ আরো গাঢ়তর হইবে।

যাহা হউক্, গীতায় সাংখ্য-প্রভাবের আর কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়াই আমরা এই অধ্যায় শেষ করিব। সাংখ্যমতে আত্মা নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতির সহিত নিজেকে এক বলিয়া ভ্রম করাতেই তাহার মনে হয় সে কর্ত্তা। এই ভ্রম ছুটিলেই সে বুঝে যে সে অকর্ত্তা, কার্য্যমাত্রই প্রকৃতির, তাহার নহে। গীতাকার কর্ম্মোপদেষ্টা এবং ঈশ্বরবাদী হইয়াও ঠিক এই কথাই বলিতেছেন। এই কথা বলাতে যে তাঁহার কর্ম্মোপদেশ অর্থহীন হইয়া যাইতেছে এবং ঈশ্বরবাদ অপ্রতিষ্ঠ হইয়া যাইতেছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। আত্মা যদি নিষ্ক্রিয়ই হইল তবে কর্ম্মোপদেশের পাত্র কে? পুরুষ যদি স্বভাবতঃ নিষ্ক্রিয়ই হইল, তবে সে কর্ম্মোপদেশের

সাংখ্যপ্রভাবের দৃষ্টান্ত

পাত্র হইতে পারে না। অচেতনা প্রকৃতিও উপদেশের পাত্রী হইতে পারে না। অজ্ঞানী পুরুষ, যে ভ্রমবশতঃ প্রকৃতির কার্য্যকে নিজের কার্য্য বলিয়া মনে করিতেছে, সেও যোগোপদেশের অপাত্র। সুতরাং কর্ম্মোপদেশ অনর্থক। সাংখ্য-প্রভাবে যে গীতার ঈশ্বরবাদও অপ্রতিষ্ঠ হইয়া যায়, কেবল সাংখ্যসঙ্গ পরিত্যাগ করিলেই তাহা সুসঙ্গত হয়, তাহা আমরা যথাস্থানে দেখাইব। যে শ্রেণীর উক্তিতে গীতায় সাংখ্যপ্রভাব প্রকাশ পায় এবং ইহার কর্ম্মোপদেশে ব্যর্থতা আনয়ন করে, সেশ্রেণীর আরো কতিপয় শ্লোক আমরা কর্ম্মষট্‌ক হইতেই নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। অন্যত্র এরূপ শ্লোক আরো অনেক আছে।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহংকার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ৩।২৭
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥ ৫।৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ উন্মিষন্ নিমিষন্ অপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্।" ৫।৯

অর্থাৎ "প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারাই সমুদায় কর্ম্ম কৃত হয়; অহংকারে বিমূঢ় আত্মা মনে করে 'আমি কর্ত্তা।' তত্ত্ববিৎ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আঘ্রাণ, আহার, গমন, নিদ্রা, শ্বাসক্রিয়া, কথন, মলত্যাগ, গ্রহণ, চক্ষু উন্মীলন ও নিমীলন, এসকল কর্ম্ম করিতে যাইয়া মনে করেন 'আমি কিছুই করিতেছি

না'। তিনি জানেন যে এসকল ব্যাপারে (প্রকৃতির বিকার-রূপী) ইন্দ্রিয়গণই ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহের উপর কার্য্য করিতেছে।"

গীতাকার ধ্যানযোগের উপদেশ দিয়া তাঁহার প্রথম ষট্‌ক শেষ করিয়াছেন। ধ্যানযোগ কর্ম্মের অন্তর্গত নহে, জ্ঞানের অন্তর্গত। ধ্যানে ব্রহ্মানুভূতি হইলে কর্ম্ম-যোগ সুগম হয় এবং কর্ম্মযোগে ধ্যান-সাধনের সহায়তা হয়, সম্ভবতঃ এই জন্যই কর্ম্মষট্‌কের শেষ-ভাগে ধ্যান উপদিষ্ট হইয়াছে। আমরা জ্ঞানযোগের কথা বলিতে গিয়া গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে পুনরাবর্ত্তন করিব।

ধ্যানযোগ

ষোড়শ অধ্যায়

ভক্তিযোগ

গীতার দ্বিতীয় ষট্‌কে ভক্তি ছাড়া অন্য নানা বিষয়েরও অবতারণা করা হইয়াছে। আমরা সেসকল বিষয় যথাস্থানে আলোচনা করিব। ভক্তি সম্বন্ধে গীতাকার তিন শ্রেণীর লোকের কথা বলিয়াছেন। নিম্নতম শ্রেণীর লোক একান্তই ভক্তিবিহীন। তাহারা ভোগেই মত্ত, তাহাদের জীবনে কোন প্রকার ভজনাই নাই। মধ্যম শ্রেণীর লোক দেবোপাসক, তাহারা নানা কাম্য বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষায় ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিয়া অস্থায়ী ফল পায়। উচ্চতম শ্রেণীর লোক ভগবদুপাসক। তাঁহাদের মধ্যে আবার চারি শ্রেণী,—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। প্রথম তিন শ্রেণীর ভক্ত ভগবৎস্বরূপ ঠিক বুঝেন নাই। অনন্তকে ঠিক বুঝিলে আর ক্ষুদ্র বস্তুর কামনা থাকে না। পরবর্ত্তী ভক্তি-ব্যাখ্যাকারেরা আর্ত্ত ভক্তের দৃষ্টান্ত স্বরূপ দ্রৌপদীর উল্লেখ করেন। তিনি কৌরব সভায় বিপদ্‌গ্রস্তা হইয়া ভগবান্‌কে ডাকিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসু ভক্তের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত অর্জ্জুন। অর্থার্থী ভক্তের দৃষ্টান্ত ধ্রুব। তিনি রাজসিংহাসনে বসিতে না পাইয়া ভগবানের নিকট তদপেক্ষা উচ্চতর স্থান চাহিয়াছিলেন। জ্ঞানী ভক্তের দৃষ্টান্ত সনৎকুমার, নারদাদি। ভগ-

ভক্তের শ্রেণী-বিভাগ

বানের ভক্তমাত্রই 'উদার', কারণ তাঁহারা তাঁহাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য অন্য দেবতার শরণ না লইয়া ভগবানের শরণ লইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানী ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে তিনি অন্য কোন উদ্দেশ্যে নহে, ভগবান্‌কে 'অনুত্তমা গতি' জানিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন। তাঁহার জ্ঞানের প্রমাণ এই যে তিনি "বাসুদেবঃ সর্ব্বম্"—"জগদ্‌ব্যাপী ব্রহ্মই সমুদায়, আর দ্বিতীয় বস্তু নাই" এই তত্ত্ব জানিয়াছেন। দেবোপাসকদের সম্বন্ধে গীতাকারের মত এই যে তাঁহাদের দেবভক্তি ভগবান্ নিজেই দেন এবং দেবতাদের নিকট হইতে তাঁহারা যে ফল পান তাহাও ভগবদ্-বিহিত। কথাটার তাৎপর্য্য এই যে ভক্তি কখনও নিষ্ফলা হয় না, ক্ষুদ্রের প্রতি ভক্তিও হৃদয়কে কিয়ৎপরিমাণে বিনীত ও সরস করে এবং ভগবদ্-ভক্তির দিকে লইয়া যায়। কিন্তু দেবপূজার ফল অস্থায়ী।

"অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥"

—"কিন্তু অল্পজ্ঞানীদের সেই ফল অস্থায়ী হয়। দেবযাজীরা দেবতাদিগকে পান, আমার ভক্তেরা আমাকে পান।" (৭।২৩)

এই দুই শ্রেণীর ভক্তের চরম গতি সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা যাইবে। ব্রহ্মোপাসকের ভক্তিসাধন সম্বন্ধে এই ষট্‌কের দশম, একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। ব্রহ্মকে এক অদ্বিতীয় অখণ্ড জানিয়াও কোন কোন সাধক বিশেষ বিশেষ

বিভূতিযোগ

বস্তু বা ব্যক্তিতে ব্রহ্মের প্রকাশ উপলব্ধি করিতে ভালবাসেন। পৌরাণিক ধর্ম্মের ইহাই প্রধান ভাব। গীতাকার তাঁহার দশমাধ্যায়ে এই পৌরাণিক ভাবের স্থান রাখিয়াছেন। অর্জ্জুন জানিতে চান ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ কি কি? কৃষ্ণ এই অধ্যায়ের প্রথম ও শেষাংশে ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব ও অখণ্ডত্বের পুনরুল্লেখ করিয়া অধ্যায়ের মধ্যস্থলে অনেকগুলি বিভূতি অর্থাৎ ব্রহ্মের বিশেষ প্রকাশের উল্লেখ করিয়াছেন। এই উল্লেখ তাঁহার বৈজ্ঞানিক ও পৌরাণিক বিশ্বাসসম্মত। তাঁহার বিজ্ঞান, দেবতত্ত্ব বা পুরাণের সহিত যে সকল স্থলে আধুনিক মতের ঐক্য হইবে তাহা আশা করা যায় না। যথা, তিনি ভগবদুক্তিরূপে বলিয়াছেন,—"নক্ষত্রাণাম্ অহং শশী" —"নক্ষত্রদিগের মধ্যে আমি চন্দ্র"। কিন্তু আধুনিক জ্যোতিঃ-শাস্ত্রানুসারে চন্দ্র আদৌ নক্ষত্রশ্রেণীর অন্তর্গত নহে, পৃথিবীর উপগ্রহ মাত্র। তিনি অন্যত্র ভগবান্‌কে দিয়া বলাইয়াছেন 'রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্'—"অস্ত্রধারীদের মধ্যে আমি রাম।" আধুনিক গবেষণায় দাশরথি ও জামদগ্ন্য রাম উভয়েরই ঐতিহাসিকত্ব সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক্, এই অধ্যায়ের মৌলিক শিক্ষা,—শক্তি, সৌন্দর্য্য ও তপস্যার বিশেষ প্রকাশ মাত্রই ভগবদুপলব্ধির সহায়। এ সম্বন্ধে কোন মতভেদ হইতে পারে না।

বিশ্বরূপ-দর্শন

একাদশ অধ্যায়ের 'বিশ্বরূপ-দর্শন' যেমন সাধনরাজ্যের অত্যুচ্চ তত্ত্ব, তেমনি ধর্ম্মসাহিত্যের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এরূপ বস্তু আর

কোন দেশের ধর্ম্মসাহিত্যে আছে বলিয়া বোধ হয় না। এদেশের সাহিত্যের মধ্যে ছান্দোগ্য পঞ্চমাধ্যায়ের বৈশ্বানর-ব্যাখ্যায় ইহার ইঙ্গিত আছে। দ্বিতীয় মুণ্ডক প্রথম খণ্ডের চতুর্থ শ্লোকে ইহা ক্ষুদ্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এসকল ইঙ্গিত অবলম্বন করিয়াই গীতাকার তাঁহার একাদশাধ্যায় লিখিয়াছেন। ভাগবতের নানা স্থানে ইহার অনুকরণ হইয়াছে, কিন্তু অনুকরণগুলি মূলের কাছেও আসিতে পারে না। যাহা হউক্, 'বিশ্বরূপ-দর্শনে'র সার মর্ম্ম এই,—অর্জ্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন 'তোমার বিশ্বরূপের কথা তো অনেক শুনিলাম, এখন তাহা নিজ চক্ষুতে দেখিতে চাই'। কৃষ্ণ বলিলেন 'এই চর্ম্মচক্ষুতে সেরূপ দেখিতে পাইবে না, তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি।' ফলতঃ বিশ্বকে তো সকলেই দেখিতেছে, বিশ্ব যে ভগবানের রূপ তাহা কয়জন জানে এবং জানিয়াও কয়জন উপলব্ধি করে? এই উপলব্ধির জন্য প্রস্তুতি চাই। সেই প্রস্তুতিই দিব্য চক্ষু। বলা বাহুল্য যে দিব্য চক্ষু এক মুহূর্ত্তে লাভ করা যায় না, তাহা দীর্ঘ সাধন-সাপেক্ষ। দিব্য চক্ষু পাইয়া অর্জ্জুন দেখিলেন সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র এবং সমস্ত জগৎ ভগবানের দেহ, ভগবানের রূপ, হইয়া গিয়াছে। যাহা কিছু ঘটিতেছে সমস্তই তাঁহার ভিতর, তাঁহার বাহিরে কিছুই নাই। যে সকল যোদ্ধা হত হইতেছেন তাঁহারা যেন তাঁহার সর্ব্বগ্রাসী মুখের ভিতরে যাইয়া পড়িতেছেন। জগতের সমুদায় রূপ, সমস্ত জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ,

অস্ত্র ও অলঙ্কারাদি তাঁহারই বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। এই রূপ দেখিয়া অর্জ্জুনের হর্ষ ও ভয় দুইই হইল। হর্ষ সহজেই বোঝা যায়। বহু বস্তুর মধ্যে মানুষ এককে হারাইয়া ফেলে। সেই বহু বস্তুই যখন সেই এক অদ্বিতীয়ের সাক্ষাৎ রূপ হইয়া প্রকাশিত হয় তখন ভক্ত অতুল আনন্দ লাভ করেন। ভয়ের কারণ কি? ভয়ের এক কারণ যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণ হত্যা-কাণ্ড। গৃহে, সামাজিক সম্মিলনে বা উপাসনালয়ে বিশ্বরূপ দেখিলে কোন ভয় হইত না। ভয়ের দ্বিতীয় কারণ বিশ্ব-রূপের বিচিত্রতার মধ্যে তাঁহার সখা ও গুরু কৃষ্ণকে হারাইয়া ফেলা। বিশ্বরূপ-দর্শনে মানুষের ব্যক্তিত্ব যে ব্রহ্মে লীন হইয়া যায় তাহা নহে। ব্রহ্মের ভিতর তাহা অক্ষুণ্ণ থাকে; কিন্তু অসংখ্য বস্তুর সঙ্গে সম্বদ্ধ ভাবে দৃষ্ট হওয়াতে তাহা এত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় যে তাহাকে চেনা কঠিন হয়। আমরা আমাদের স্বজনদিগকে সর্ব্বদা যে দৃষ্টিতে দেখি সে দৃষ্টি অতি অসম্যক্ দৃষ্টি। এরূপ অসম্যক্ দৃষ্টিতে দেখি বলিয়াই তাহাদিগকে এত ক্ষুদ্র বোধ হয় এবং তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা ও অনাদর সম্ভব হয়। সম্যক্ দৃষ্টিতে দেখিলে প্রত্যেক জীবাত্মাতেই সর্ব্বময় সর্ব্বরূপী পরমাত্মা প্রকাশিত হন। উপনিষদের ঋষিরা তো নানা স্থানে নানা ভাবেই এই তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। উদ্দালক আরুণি শ্বেতকেতুকে বলিয়াছেন 'তৎ ত্বমসি'। সনৎকুমার বলিয়াছেন 'অহমেবেদং সর্ব্বম্'। 'বিশ্বরূপ-দর্শনে' এই তত্ত্বই সমাধিমূলক কবিত্বের ভাষায়

ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যাহা হউক্, অর্জ্জুন বিশ্বরূপের অনেক স্তব স্তুতি করিলেন, যুদ্ধ ও বিনাশ কার্য্যের উদ্দেশ্যের কথা শুনিলেন এবং তৎপরে কৃষ্ণকে পুনরায় তাঁহার মানুষরূপ ধারণ করিতে মিনতি করিলেন। সময়ে সময়ে ভগবানের বিশ্বরূপ-দর্শন একান্ত আবশ্যক, নচেৎ আমাদের চিরাভ্যস্ত অসম্যক্ দৃষ্টি সংশোধিত হয় না। নচেৎ জগৎকে কেবল জড়জগৎ বলিয়াই বোধ হয় এবং মানুষকে কেবল মানুষ বলিয়াই বোধ হয়। এরূপ অসম্যক্ দৃষ্টিই সমুদায় পাপ ও অপ্রেমের কারণ। বিশ্বরূপ-দর্শনে পাপ ও অপ্রেমের মূলে আঘাত পড়ে এবং মানুষের প্রতি ব্যবহারের উচ্চ আদর্শ প্রকাশিত হয়। কিন্তু আমরা সকল সময় সেরূপ দর্শনের অবস্থায় থাকিতে পারি না, এবং যখন সে অবস্থা প্রাপ্ত হই তখনও বেশী ক্ষণ সেভাবে তিষ্ঠিতে পারি না, চিরাভ্যস্ত ভেদ-দৃষ্টির সহিত ইহার সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া পুনরায় ভেদ-দৃষ্টিই পাইতে ইচ্ছা হয়। অর্জ্জুনের সেই দশাই হইয়াছিল। তাঁহার প্রার্থনায় কৃষ্ণ মানুষরূপ ধারণ করিলেন। অর্জ্জুন তাহাতে আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু অভ্যস্ত ভেদদৃষ্টির সময়ে কৃষ্ণকে কেবল সখামাত্র মনে করিয়া কত অসম্মান ও পরিহাস করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। 'বিশ্বরূপদর্শন' যাঁহারা বুঝেন এবং এই সাধনের অভিজ্ঞতা যাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্রও আছে, তাঁহারা এসকল বর্ণনার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবেন, সন্দেহ নাই।

এই সাধনের অবস্থায় সাধক নিজে এবং তাঁহার জ্ঞাত স্মৃত সমুদায় বস্তু ও ব্যক্তিই বিশ্বরূপের অন্তর্গত হইয়া অদ্ভুতরূপে পরিবর্ত্তিত হয়, আবার সাধনান্তে অভ্যস্ত রূপ ধারণ করে। কিন্তু সাধনের প্রভাব ধীরে ধীরে কার্য্যগত জীবনে ব্যাপ্ত হয়। আমরা ২।৪ কথায় একটা প্রকাণ্ড ব্যাপারের অতি অল্প একটু পরিচয় দিলাম। অধ্যায়টী বার বার মনোযোগের সহিত পড়া ও বুঝিতে চেষ্টা করা আবশ্যক।

সগুণ ও নিগুর্ণের উপাসনা

'দ্বাদশাধ্যায়ে বিশেষ ভাবে ভক্তিযোগ আলোচিত হইয়াছে। প্রথমেই অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ভাবে, অর্থাৎ সগুণ বিশ্বরূপী ভগবান্‌রূপে, যাঁহারা ব্রহ্মের উপাসনা করেন, এবং যাঁহারা নিগুর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, এই দুই শ্রেণীর সাধকের মধ্যে কোন্ শ্রেণী শ্রেষ্ঠ,—'যোগবিত্তমাঃ' ?" সগুণ-নিগুর্ণের সম্বন্ধ ও আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে এরূপ প্রশ্ন সহসা অর্থহীন বলিয়া বোধ হইবে। সগুণ শব্দের অর্থ গুণযুক্ত অর্থাৎ গুণের আশ্রয়। গুণভেদের অতীত না হইলে, অভেদ না হইলে, গুণের আশ্রয় হওয়া যায় না। রূপ-রসাদি—গুণ। ইহারা পরস্পর হইতে ভিন্ন। কিন্তু রূপ-রসের ভেদ যে জানে, যাহার জ্ঞানে রূপ-রস আশ্রিত, সে এই ভেদের অতীত এবং এই অর্থেই নিগুর্ণ। 'নিগুর্ণে'র অর্থ 'গুণের সহিত সম্বন্ধবর্জ্জিত' নহে। যে গুণের সহিত সম্বন্ধবর্জ্জিত, সে নিগুর্ণ হইতে পারে না। দেশের

ভেদ, এখান-সেখানের ভেদ, যে জানে, সে এই ভেদের অতীত এবং এই অর্থেই নির্গুণ, 'দেশের সহিত সম্বন্ধ-বর্জ্জিত' এই অর্থে নির্গুণ নহে। তেমনি কালের ভেদ, এখন-তখনের ভেদ, যাঁহার জ্ঞানের আশ্রিত, সে কালাতীত এবং এই অর্থেই নির্গুণ, 'কালের সহিত সম্বন্ধ-বর্জ্জিত' এই অর্থে নির্গুণ নহে। সগুণ নির্গুণের এই অর্থ স্মরণ রাখিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে কেবল সগুণের উপাসনা বা কেবল নির্গুণের উপাসনা সম্ভব নহে। একই ব্রহ্ম সগুণ নির্গুণ দুইই। গীতাকারও একথা বিশেষরূপে জানেন। কিন্তু তাঁহার উপরি-উক্ত প্রশ্নে যেন মনে হয়, সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। গীতাকার যে তাহা মনে করেন তাহা গীতা মনোযোগপূর্ব্বক পড়িলে বিশ্বাস হয় না। তবে এই প্রশ্নের অর্থ কি ? অর্থ কেবল এই হইতে পারে,—একই ব্রহ্ম সগুণ নির্গুণ দুইই হইলেও আমাদের ব্রহ্মভাবনার কোন অবস্থায় গুণের চিন্তা, ভেদ বা বহুর চিন্তা, খুব কম থাকিতে পারে। গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে বর্ণিত 'ধ্যান' তাহার দৃষ্টান্ত। তাহাতে যে জগতের চিন্তা নাই, তাহা নহে। জগতের চিন্তা এড়াইতে চেষ্টা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা একেবারে যায় নাই। যে আত্মাকে ধরিতে চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা জগতেরই জ্ঞাতা ও আশ্রয়। জ্ঞেয়ের চিন্তা, আশ্রিতের চিন্তা, একেবারে ছাড়িয়া জ্ঞাতা ও আশ্রয়কে ধরা যায় না। কিন্তু সে অবস্থায় যে জগতের চিন্তা খুব কমিয়া গিয়াছে তাহাতে

কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাকে নির্গুণের উপাসনা বলা যায়। পক্ষান্তরে, একাদশাধ্যায়ে, গুণের ভাবনা, ভেদ ও বহুর ভাবনা, খুব বেশী; অথচ তাহাতে একের ভাবনা,—বহুর মধ্যে এক যিনি, ভেদের মধ্যে অভেদ যিনি, তাঁহার ভাবনা,—নিশ্চয়ই আছে; না থাকিলে বিশ্বরূপ-দর্শন হয় না। এই দর্শনকে বলা যায় সগুণের উপাসনা। তাহা হইলে উপরি-উক্ত প্রশ্নের প্রকৃত অর্থ এই দাঁড়াইল,—উপাসনার সময় বহুর ভাবনা বেশী থাকা ভাল, না একের ভাবনা বেশী থাকা ভাল? কৃষ্ণ এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন তার মর্ম্ম এই,—সগুণভাবে, বিশ্বরূপী ভাবে, ভগবানের উপাসনা না করিয়া যাঁহারা একবারেই নির্গুণকে ধরিতে যান, 'অব্যক্তা গতি' লাভ করিতে চান, তাঁহাদের খুব কষ্ট হয়। কিন্তু তাঁহারা সকলের প্রতি সমদর্শী, সর্ব্বভূত-হিতে রত, হইয়া সাধন করিলে তাঁহাদিগকে সগুণ উপাসনায় আসিতেই হইবে। পক্ষান্তরে যাঁহারা সগুণের উপাসনা করেন তাঁহারা যে মর্ত্ত্য জগতেই আবদ্ধ থাকেন তাহা নহে, তাঁহারাও অবশেষে অমৃতত্ব ও পরাগতি লাভ করেন। অমৃতত্ব ও পরাগতি সম্বন্ধে গীতাকারের মত না জানা পর্য্যন্ত এই উত্তরটা পাঠকের সম্পূর্ণ বোধগম্য হইবে না। এখন এই পর্য্যন্ত বোঝা গেল যে ভক্তিসাধনে সগুণ উপাসনাই অবলম্বনীয়। কিন্তু সগুণ উপাসনার অর্থ মূর্ত্তিপূজা নহে। এই অধ্যায়ে বা অন্য কোন স্থানে গীতাকার জ্ঞানীর পক্ষে মূর্ত্তিপূজার ব্যবস্থা দেন নাই।

ভক্তিসাধনের ক্রম সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম এই,—ব্রহ্মে চিত্ত-সমাধানই ভক্তির সার। কিন্তু চিত্ত-সমাধান সহজ কার্য্য নহে। সমাধান করিবার চেষ্টায় চিত্ত বার বারই চঞ্চল হইয়া ব্রহ্ম হইতে বিচ্যুত হয়। চিত্তকে স্থির করিবার উপায় 'অভ্যাস', অর্থাৎ চঞ্চল চিত্তকে বারবার ফিরাইয়া আনিয়া ব্রহ্মে স্থাপন করা। কিন্তু এই অভ্যাসও সহজ নহে। যাঁহারা স্থিরচিত্তে কর্ম্ম করিতে অনভ্যস্ত তাহারা ভজনাতেও চিত্ত স্থির করিতে পারিবে না। সুতরাং অভ্যাস সাধন করিতে হইলে কর্ম্ম সাধন করা চাই—ঈশ্বরার্থে, ঈশ্বরের দাসরূপে, কর্ম্ম করা চাই। এরূপ ব্রহ্মার্পিত কর্ম্মও কঠিন। এই ভাবে কর্ম্ম করিতে গেলে ত্যাগ-বুদ্ধি চাই, কর্ম্মের ফলে অনাসক্ত হইয়া কেবল কর্ত্তব্যবোধে কাজ করা অভ্যস্ত হওয়া চাই। যে অভ্যাসের কথা বলা হইয়াছে, সেই অভ্যাসও আবার দুরকম। সাধ্য বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ না করিয়া কেবল নামোচ্চারণরূপ অভ্যাস নিম্ন স্তরের সাধন। তার উর্দ্ধে বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান এবং তন্মূলক অভ্যাস। জ্ঞান কেবল বিচারে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না, জ্ঞান ধ্যানে পরিণত হওয়া চাই। যাহা হউক্, 'ভক্তিযোগ' অধ্যায়ের শেষভাগে গীতাকার ভক্ত-জীবনের একটী চিত্র আঁকিয়াছেন। ভক্তের চরিত্রে কি কি গুণ ফুটে, কিরূপ ভক্ত ভগবানের প্রিয়, তাহাই বলিয়াছেন। পাঠক এই চিত্রটি মনোযোগের সহিত পড়িবেন এবং দ্বিতীয়াধ্যায়ের

ভক্তিসাধনের ক্রম

'স্থিতপ্রজ্ঞের' চিত্র ও অষ্টাদশ অধ্যায়ের 'জ্ঞানের পরানিষ্ঠা'র চিত্রের সহিত তুলনা করিবেন। দেখিবেন যে এই তিন চিত্র মূলে একই। তার কারণ এই যে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান পরস্পরের সহিত এমন ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ, যে একটীকে সম্যক্‌রূপে সাধন করিতে গেলে অপর দুটীও আসিয়া পড়ে। আরো দেখিবেন যে এই তিন চিত্রেই কর্ম্মের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সে উল্লেখ অসম্পূর্ণ। মানব সমাজকে সংস্কৃত ও উন্নত করিতে হইবে, এই সঙ্কল্প তিন চিত্রের কোনটীতেই নাই। সামাজিক সংস্কার ও উন্নতির আদর্শ ও প্রণালী-সম্বন্ধে ধারণা একবারেই নাই। আধুনিক উচ্চ চিন্তায় এই আদর্শ ও প্রণালী ফুটিতেছে। জ্ঞানী ভক্তিসাধক এই বিকাশে নিশ্চয়ই আনন্দ লাভ করিবেন এবং ইহাকে নিজ সাধনের অঙ্গীভূত করিবেন। কিন্তু আধুনিক চিন্তা যে ভ্রান্ত পথে পড়িয়া সহজেই বিপদ্‌গ্রস্ত হয় তিনি সেই ভ্রম ও বিপদ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবেন। সেই ভ্রম—বহুর মধ্যে এককে হারাইয়া ফেলা। সেই বিপদ—কর্ম্মের উত্তাপে প্রেম-ভক্তি শুষ্ক হইয়া যাওয়া।

সপ্তদশ অধ্যায়

জ্ঞানযোগ

জ্ঞানযোগের প্রথম স্তর জগৎ ও জীবের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধবিষয়ে জ্ঞানলাভ করা। জ্ঞানলাভ দুই উপায়ে হইতে পারে ; (১) স্বাধীন চিন্তা দ্বারা, (১) শাস্ত্রোপদেশ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণদ্বারা। উপনিষদের ঋষিগণ প্রথমোপায়েই জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ে ব্রহ্মজ্ঞান-শাস্ত্র ছিল না, এই শাস্ত্র তাঁহাদের স্বাধীন চিন্তা হইতেই প্রসূত হয়। গীতাকারের সময়ে উপনিষদ্ প্রামাণিক শাস্ত্ররূপে গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে যেমন এক দিকে উচ্চ চিন্তালাভ সুলভ হইয়াছিল, তেমনি অপর দিকে শাস্ত্রলব্ধ পরোক্ষ জ্ঞানে তৃপ্ত হইয়া স্বাধীন চিন্তায় বিমুখ হওয়া পণ্ডিত ব্যক্তিদের পক্ষেও সাধারণ হইয়া উঠিয়াছিল। গীতাকার উপনিষদ্ ও সাংখ্য দর্শনের মত গ্রহণ করিয়াছেন এবং নিজ মতে উভয়কে মিলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, একথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। এই দুই চিন্তাধারাকে স্বাধীন বিচারদ্বারা ধরিতে তিনি কত দূর চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। গীতায় স্বাধীন চিন্তা ও বিচারের নিদর্শন পাওয়া যায় না। বিচারের স্থলে কতিপয় উপমা পাওয়া যায়। শ্রদ্ধাবান্ কিন্তু চিন্তাবিহীন লোক এসকল উপমায়ই সন্তুষ্ট। কিন্তু উপমা প্রমাণ নহে।

উপমামূলক জ্ঞান

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি যে দেশকালাশ্রিত বস্তুর সম্বন্ধ দেশকালাতীত জগতে আরোপিত হইতে পারে না। ব্রহ্মের জীবভূতা পরাপ্রকৃতি জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, "যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ" (৭।৫) ইহা ঠিক্, কিন্তু আত্মার পক্ষে জগৎকে ধরিয়া থাকা ব্যাপারটা কি, তাহা জ্ঞান-বিশ্লেষণদ্বারা না বুঝাইলে লোকে মানুষের স্কন্ধে কোন ভারী বস্তু ধারণ অথবা জলপাত্রে জলধারণের কথাই ভাবিবে, পরমাত্মার পক্ষে জগৎধারণ কিরূপ ব্যাপার তাহা কিছুই বুঝিবে না। তেমনি "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব" (৭।৭) এ কথাতেও জগৎ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ বোঝা যাইবে না, বরঞ্চ মণিগুলি যেমন সূত্রে গ্রথিত না হইলেও থাকিতে পারে, লোকের মনে হইবে জগতের উপাদান জড়পরমাণুও তেমনি ঈশ্বর হইতে স্বাধীনভাবে থাকিতে পারে। "বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্" (৭।১০) এটি আর একটী উপমা। ইহাও জীব-ব্রহ্ম বা জগৎ-ব্রহ্মের সম্বন্ধ বুঝাইবার পক্ষে অনুপযোগী। বীজ নিজের বাহির হইতে রসাকর্ষণ করিয়া বৃক্ষরূপে পরিণত হয়,বৃক্ষে বীজের বীজত্ব একবারেই থাকে না। জগৎ ও জীবের সহিত ব্রহ্মের যে সৃষ্টি-স্রষ্টা ও আশ্রিত-আশ্রয়ের সম্বন্ধ, তাহা তো কোন অংশেই এরূপ নহে। উপমাতে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ের, স্রষ্টৃ-সৃষ্টির, ভেদাভেদ সম্বন্ধ প্রকাশিত হয় না। গীতাকার তাঁহার ত্রয়োদশাধ্যায়ে জগৎ ও ব্রহ্মের

মধ্যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এই সম্বন্ধের সম্যক্ অর্থ তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। জ্ঞেয়-জ্ঞাতা যে দুটা স্বতন্ত্র বস্তু নহে, একই বস্তুর দুটা দিক্, একই বস্তুকে সত্তা ও জ্ঞান এই দুভাবে দেখা, তাহা সম্ভবতঃ তিনি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন নাই। সাংখ্যের দ্বৈতবাদ তাঁহার মনকে এমন অধিকার করিয়া বসিয়াছে যে ঋষিদের অদ্বৈত ভাব তিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র, ইহার ভিতরে তিনি গভীরভাবে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। এই ত্রয়োদশাধ্যায়ে এবং অব্যবহিত পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাঁহার উপর সাংখ্য প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞকে, প্রকৃতি-পুরুষকে, জোড়া দিবার অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই জোড়া দিতে পারেন নাই, উহারা তাঁহার কাছে স্বতন্ত্র বস্তুই থাকিয়া গিয়াছে। তাঁহার মতে উহাদের সংযোগে জগতের নানা বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে (১৩৷২৬), কিন্তু এই সংযোগ আকস্মিক ও অস্থায়ী, অবশ্যম্ভাবী ও চিরস্থায়ী নহে। এরূপ মত প্রকৃত পক্ষে দ্বৈতবাদ, উপনিষদের অদ্বৈতবাদের সহিত ইহার সামঞ্জস্য কিছুতেই হইতে পারে না। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সাময়িক যোগটাও গীতাকার সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন না, তিনি ইহাদের মধ্যে কাজের ভাগাভাগি করিয়াছেন। যথা,

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদি উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥
কার্য্যকারণ-কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥"

—"প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে অনাদি বলিয়া জান। জান যে বিকার এবং গুণসমূহ প্রকৃতি-সম্ভূত। কার্য্য-কারণের কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতিকেই হেতু বলা হয় এবং সুখদুঃখের ভোক্তৃত্বে পুরুষকেই হেতু বলা হয়।" (১৩।১৯,২০) কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বে কি বিভাগ সম্ভব? দুটা তো একই চিন্তার দুটা দিক্‌মাত্র। কিন্তু গীতাকারের মতে পুরুষ যে নিষ্ক্রিয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই অধ্যায়ে তিনি সে কথার পুনরুক্তি করিতেছেন,—

"প্রকৃত্যৈব তু কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানম্ অকর্ত্তারম্ স পশ্যতি॥"

—"যিনি দেখেন যে সর্ব্বত্র প্রকৃতিই কর্ম্ম করিতেছে, এবং আত্মা অকর্ত্তা, তিনিই ঠিক দেখেন।" পুরুষ নিষ্ক্রিয়, অকর্ত্তা, এই মতই সাংখ্য নিরীশ্বরবাদের মূল। পুরুষ বা আত্মাকে নিষ্ক্রিয় বলা অথচ জগতের স্রষ্টৃরূপে এক জন পরম পুরুষ পরমাত্মা মানা, অসঙ্গত ও স্ববিরোধী ব্যাপার। গীতাকার উপনিষদের অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার গ্রন্থের অনেক স্থলেই ব্রহ্মকে কর্ত্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন ৯।১৯, ১৫।১৩,১৪ ও ১৬।১৯। কিন্তু তাঁহার এই

ঈশ্বরবাদ কেবল শ্রদ্ধাপ্রসূত, যুক্তির মুখে ইহা টেঁকে না। সাংখ্য ও বেদান্তকে মিলাইবার জন্য তিনি একটি সহজ উপায় অবলম্বন করেন, কিন্তু ইহাতে তাহাদের মিল হয় না। সাংখ্য প্রকৃতিকে কেবল প্রকৃতিই বলিয়াছেন। কিন্তু গীতাকার তাঁহার সপ্তমাধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে ভগবান্‌কে দিয়া বলাইয়াছেন,—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥"

—"ভূমি, অপ্, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার, ইহারা আমার অষ্টধা ভিন্না প্রকৃতি।" সাংখ্য যাহাকে কেবল 'প্রকৃতি' অর্থাৎ প্রাতিভাষিক 'বিকৃতির' পশ্চাতে অবিকৃত মূলবস্তু বা স্বভাব বলিয়াছেন তাহাকেই গীতার ঈশ্বর "মে প্রকৃতিঃ" বলিতেছেন। গীতাকার যদি সাংখ্যের শক্তিরূপিণী প্রকৃতিকে ব্রহ্মস্বভাবের অন্তর্গত মনে করিতেন, অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রকৃত পক্ষে কর্ত্তা বলিয়া মানিতেন, তবে উপনিষদের ঋষিগণের সঙ্গে তাঁহার কোন বিরোধই থাকিত না। কিন্তু তিনি তো সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা স্বীকার করেন না। অন্য স্থলের কথা দূরে থাক্,—সেরূপ স্থল আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি,—এস্থলেই, পরের শ্লোকেই, তিনি এই 'মে প্রকৃতি'কে 'অপরা' বলিয়া তাহাকে 'পরা' হইতে কতকটা তফাৎ করিয়া দিতেছেন। পরে তফাৎ খুব বেশী হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। যেমন এই

শ্লোকাংশে,—"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্"। (৯।১০)। ঈশ্বর অধ্যক্ষমাত্র, কর্ত্রী প্রকৃতিই। কিন্তু নিষ্ক্রিয়ের পক্ষে 'অধ্যক্ষতা'ই বা কিরূপে সম্ভব হয়? অধ্যক্ষতাতেও ক্রিয়াশীলতা আবশ্যক। যাহা হউক্, ঈশ্বর অধ্যক্ষ, প্রকৃতি কর্ত্রী, ইহাতে ঈশ্বর হইতে প্রকৃতির ভিন্নতা স্পষ্টই প্রকাশ পায়। কিন্তু এবিষয়ে আর অধিক বলিবার অবকাশ নাই; চতুর্দ্দশাধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সম্বন্ধে কিছু বলিয়া বিষয়ান্তরে যাই। সেই অধ্যায়ে গীতাকার বলিয়াছেন যে সত্ত্ব, রজঃ, তম, এই যে প্রকৃতির তিন গুণ, ইহারা সকলেই বন্ধনের কারণ। ইহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, কিন্তু ইহাও জীবকে বন্ধন করে,—

গুণত্রয়-বিভাগ

"সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ।"

—'সুখাসক্তিতে বন্ধন করে এবং জ্ঞানাসক্তিতে বন্ধন করে।' সুতরাং সাধককে একবারে গুণাতীত হইতে হইবে। সৃষ্টি তো তিন গুণেরই কার্য্য, সুতরাং গুণাতীত হইতে হইবে ইহার অর্থ সৃষ্টির অতীত হইতে হইবে। সৃষ্টির ভিতরে থাকা আর বদ্ধ থাকা এক কথা। ষোড়শাধ্যায়ে গীতাকার দেখাইয়াছেন যে গুণত্রয়ের তারতম্যে মানবপ্রকৃতি দৈবী ও আসুরী এই দ্বিবিধ 'সম্পত্তি'তে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। অসুরদের দৌরাত্ম্য বর্ণনা করিয়া তিনি ভগবান্‌কে দিয়া বলাইয়াছেন,—

"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রম্ অশুভান্ আসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥"

—"হে কৌন্তেয়, এই দ্বেষযুক্ত, ক্রূর, সংসারে নরাধম, অপবিত্র ব্যক্তিদিগকে আমি বারবার আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি। জন্মে জন্মে আসুরী-যোনিপ্রাপ্ত এই মূঢ়েরা আমাকে না পাইয়া অবশেষে অধম গতি প্রাপ্ত হয়।" (১৯, ২০) এই বর্ণনা পড়িয়া বাইব্‌লের ক্রোধী ঈশ্বর ও তাঁহার বিরোধীদিগের নরকে পতনের বিবরণ স্মরণ হয়। বাইব্‌ল্ দ্বৈতবাদী। কেবল জড় ও আত্মার মধ্যে নহে, ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যেও বাইব্‌ল্ একান্ত ভেদ মানেন। দ্বৈতবাদীর পক্ষে উদ্ধৃত বর্ণনা সম্ভব। উপনিষদের অদ্বৈত ব্রহ্ম, যিনি বিশ্বরূপী এবং জীবের অন্তরাত্মা, তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিলে এরূপ বর্ণনা সম্ভব হয় না। জীবের সকল অবস্থায়ই সে ব্রহ্মকৃপার পাত্র। অবোধ ও চলনে অক্ষম শিশুর মাটিতে পড়া, কাদামাখা বা সাপের সঙ্গে খেলা করা মায়ের কাছে যাহা, অজ্ঞানী ও দুর্ব্বল মানবের দুঃখ দুর্দ্দশা ঈশ্বরের কাছে তাহাই। সুতরাং গীতাকার নিশ্চয়ই সাংখ্য দ্বৈতবাদের প্রভাবে ঈশ্বরের উপর উক্ত কটূক্তি আরোপ করিয়াছেন। যাহা হউক্, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ,

এই তিন গুণকে বিভাগসূত্ররূপে অবলম্বন করিয়া শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধার পাত্র, আহার্য্য বস্তু, যজ্ঞ, তপ, দান, ত্যাগ, জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, বুদ্ধি, ধৃতি, সুখ এই সমুদায়কে উত্তম, মধ্যম ও অধম, এই তিন তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আমরা এই বিভাগের ভিতর বিশেষভাবে প্রবেশ করিব না। এরূপ বিভাগ কর্ম্মজীবনে অনেক স্থলে সহায় হইতে পারে। এবিষয়ে আমাদের এইমাত্র বক্তব্য,—যাহা ইতিপূর্ব্বেই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে,—যে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়কে ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে স্বতন্ত্রা প্রকৃতির ক্রিয়া বলিয়া মনে করা, ইহাদের তিনটিকেই বন্ধনের কারণ বলিয়া বর্ণনা করা, এবং ধর্ম্মজীবনে ইহাদের প্রকাশের মধ্যে একান্ত ভেদ দর্শন করা, এ সমস্তই সাংখ্য দ্বৈতবাদের কথা; এই মত অদ্বৈতবাদিনী উপনিষদের সম্মত নহে। উপনিষদের যে স্থল হইতে সাংখ্য গুণত্রয়ের মত গ্রহণ করিয়া দ্বৈতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়—যেখানে পুরুষ-প্রকৃতি ভেদের নামগন্ধও নাই,—সেখানে অদ্বৈত 'সৎ'বস্তু বলিতেছেন,—'বহুস্যাং প্রজায়েয়'—'বহু হই, প্রাণীরূপে উৎপন্ন হই।' যে অদ্বিতীয় বস্তু এই কথা বলেন তাঁহার ভিতরে স্বগত ভেদ, এক এবং বহুর সম্বন্ধবোধ,—না থাকিলে তিনি এই কথা বলিতে পারিতেন না। ঋষি নিজ আত্মাতে এই ভেদ দেখিয়াই এই বাণী ব্রহ্মে

আরুণির তেজ, অপ্ ও অন্ন

আরোপ করিয়া থাকিবেন, অথবা অন্য ভাষায় বলিতে গেলে, এই ব্রহ্মবাণী শুনিয়াই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। ঋষি ভেদটা যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও তাঁহার অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষালব্ধ বলিয়া মনে হয়। তিনি জগতের বস্তুগুলি বিশ্লেষণ করিয়া সমুদয়ের ভিতরেই তিনটী উপাদান পান,—তেজ, অপ্‌ ও অন্ন। আমাদের দৃষ্ট তেজ, অপ্‌ ও অন্ন, অর্থাৎ অগ্নি, জল ও মৃত্তিকা, মিশ্রিত বস্তু। ঋষি এই মিশ্রণের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তিনটী মূল বস্তু পান;—জ্ঞান, শক্তি ও এ-দুইয়ের অভাব। অগ্নি হইতে মূল ধারণা বা তত্ত্ব পাইলেন প্রকাশ বা জ্ঞান, যার আনুষঙ্গিক ফল আনন্দ। জলের গতি এবং দ্রব্যান্তরকে সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট করিবার গুণ হইতে পাইলেন কর্ম্মশক্তি, যার অবান্তর ফল আসক্তি। অন্নের উৎপত্তিস্থল যে মৃত্তিকা, তার স্থিতিশীলতা ও আলোকনিরোধের গুণ দেখিয়া তাহাকে প্রথম দুই তত্ত্বের বিপরীত বলিয়া কল্পনা করিলেন। সাংখ্য তাহাকে 'তমঃ' নাম দিয়া এবং অজ্ঞান, জড়তা এবং দুঃখের কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া ইহার যথার্থ স্বভাবই প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক্, এক অদ্বিতীয় 'সৎ'বস্তুর সসীম ব্যক্ত ভাবকে 'তেজ', 'অপ্' ও অন্নই বলা যাক্, আর সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃই বলা যাক্, ইহারা যখন জ্ঞান, শক্তি ও এ-দুইয়ের অভাবের নামান্তর মাত্র, এবং ইহাদের ফল যখন প্রকাশ, সুখ, কর্ম্ম, ইচ্ছা, দ্বেষ,

দুঃখ, জড়তা ইত্যাদি, যে সমস্তই আত্মাশ্রিত, আত্মসাপেক্ষ, তখন ইহাদিগকে কোন অনাত্মবস্তুর কার্য্য বলা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। এবং ইহাদিগকে জীবের বন্ধন ও অমঙ্গলের কারণ বলাও অযৌক্তিক। জীবের কল্যাণের পক্ষে তেজ, সত্ত্ব বা জ্ঞানের যেমন প্রয়োজন, অপ্, রজঃ বা ক্রিয়াশক্তিরও তেমনি প্রয়োজন, এবং যথাসময়ে জ্ঞান ও ক্রিয়ার নিবৃত্তিরূপ অন্ন বা তমঃ অর্থাৎ বিস্মৃতি, বিশ্রাম ও নিদ্রার তেমনি প্রয়োজন। জ্ঞান-অজ্ঞান, ক্রিয়া-নিষ্ক্রিয়তা, রাগ-দ্বেষ, সুখ-দুঃখ, এসকল দ্বন্দ্ব বা যুগলের মধ্যে আমরা যতই ভেদ দেখি না কেন, বস্তুতঃ এই ভেদ একান্ত নহে, এই ভেদের ভিতরে নিশ্চয়ই অভেদ আছে। দ্বন্দ্ব বা সংগ্রামের ভিতর দিয়াই প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়। 'কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ' দ্বারাই ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিতে হইবে। সুতরাং নিরীশ্বর সাংখ্য এবং তৎপ্রভাবিত বৈদান্তিক যে চান যে গুণময়ী সৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া এবং ক্রমশঃ ইহাকে অতিক্রম করিয়া কৈবল্য বা নির্ব্বাণ লাভ করিবেন, তাহা সম্ভব ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না, এবং তাহা গুণাশ্রয় ও মঙ্গলময় ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়াও মনে হয় না। গুণাতীত ভগবানই যখন গুণকর্ম্মে ব্যস্ত, তখন জীবের পক্ষে সেই ব্যস্ততা ছাড়িবার চেষ্টা দুঃসাহস ও নিষ্ফল চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কর্ম্মে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামলাভের ইচ্ছা স্বাভাবিক ও নির্দ্দোষ।

সাময়িক বিশ্রামের ব্যবস্থা তো ঈশ্বরেরই বিধান এবং আমাদেরও করায়ত্ত। সেই বিশ্রাম, বিস্মৃতি ও নিদ্রা 'তামসিক' হইলেও নিন্দার উপযুক্ত নহে। তবে যাঁহারা একান্ত বিশ্রাম চান, অর্থাৎ মুক্তির নামে বিনাশ ও অনস্তিত্ব চান, তাঁহাদিগকে সম্প্রতি এইমাত্র বক্তব্য যে সেই লক্ষ্য কর্ম্মযোগ, ভক্তি-যোগ, জ্ঞানযোগ, এই ত্রিবিধ যোগচেষ্টার কোন চেষ্টারই সাধ্য বস্তু নহে। গীতাকার নিজেই প্রকারান্তরে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের চিত্রত্রয়ের কোন চিত্রেই কর্ম্মহীনতা উপদিষ্ট হয় নাই। কিন্তু তাঁহার সাংখ্যপ্রীতি অসাক্ষাৎভাবে কর্ম্মহীনতাই শিক্ষা দেয়। কর্ম্মযোগের অধ্যায়ে তাহা ইতিপূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।

এখন আমরা গীতার অভ্যাস বা ধ্যানযোগের কথা সংক্ষেপে বলিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব। পাঠক

ধ্যানযোগ

দেখিবেন যে গীতাকার ধ্যানযোগের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে পতঞ্জলির অষ্ট যোগাঙ্গের মধ্যে কেবল প্রাণায়াম ছাড়া অন্য সমস্ত অঙ্গই—'বহিরঙ্গ' ও 'অন্তরঙ্গ' উভয়ই—আছে। প্রাণায়ামের কথা গীতাকার ৪।২৯ ও অন্যান্য স্থানে বলিয়াছেন। যম-নিয়মের সার কথা চিত্তকে পবিত্র রাখা, ইন্দ্রিয়গুলিকে বুদ্ধির বশবর্ত্তী রাখা। ইহার কথা প্রথম ষট্‌কের নানা স্থানে এবং এই অধ্যায়েরও ১-৯ ও ১৬, ১৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে। আসন অর্থাৎ উপযুক্ত বসিবার স্থান এবং শরীরের অবস্থিতি

সম্বন্ধে ১০-১৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে। প্রত্যাহার অর্থাৎ বিষয় হইতে মনকে আকৃষ্ট করিয়া আত্মাতে স্থাপনের কথা ২৪-২৬ শ্লোকে বলা হইয়াছে। এই পাঁচটী হইল যোগের 'বহিরঙ্গ'। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই 'অন্তরঙ্গ' যোগের কথা ১৯-২৩ এবং ২৭, ২৮ শ্লোকে কথিত হইয়াছে। ২৫এর শ্লোকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে,—"আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ"—"মনকে আত্মসংস্থ করিয়া অর্থাৎ আত্মাতে স্থাপন করিয়া কিছুই চিন্তা করিবে না।" যাঁহারা ধ্যান ও চিন্তাকে এক মনে করেন এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে একান্ত ভিন্ন বস্তু মনে করেন, তাঁহাদের কাছে এই নির্দ্দেশটী অবোধ্য মনে হইবে। মনে হইবে ব্রহ্মসম্বন্ধে চিন্তা না করিলে আর ধ্যান কি হইল? কিন্তু ব্রহ্মসাধনের শাস্ত্রে 'ধ্যান' চিন্তা নহে। 'ধ্যান' সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মদর্শন। এই ব্রহ্মদর্শনকেই বলা হইয়াছে 'মনকে আত্মসংস্থ করা'। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মৌলিক একত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক কথা বলা হইয়াছে। জীবাত্মাকে সম্যক্‌ভাবে, স্বরূপে, অনন্তের অন্তর্ভূতরূপে, দেখাই ব্রহ্মদর্শন। এই দেখার অবস্থায় মন চিন্তা করে না, এদিক্ ওদিক্ যায় না, এক দৃষ্টিতে ব্রহ্মের দিকে চাহিয়া থাকে এবং

"সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তং সুখম্ অশ্নুতে"

—"অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ ভোগ করে।"

ব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ এমন সাক্ষাৎ, অব্যবহিত, যে গীতাকার

ব্রহ্মানুভবের সুখকে 'দর্শন' বলিয়া তৃপ্ত হইলেন না,—দর্শনে বস্তু দূরে থাকিতে পারে,—'স্পর্শ' কথাটা ব্যবহার না করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইল না। ধ্যানসাধনে যাঁহারা অভ্যস্ত তাঁহারা এবিষয়ে গীতাকারের সহিত একমত হইবেন। যাজ্ঞবল্ক্য বরঞ্চ এবিষয়ে আর এক পদ অগ্রসর। তিনি জীবের সাক্ষাৎ ব্রহ্মোপলব্ধিকে আলিঙ্গন না বলিয়া থাকিতে পারেন নাই। "এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ" (বৃহ, ৪।৩।২১)। যাহা হউক্, বর্ণিত সাধন অভ্যস্ত হইলে আমাদের জ্ঞানগত ও কার্য্যগত জীবনে তাহার কি ফল হয়, তৎসম্বন্ধে গীতাকার তাঁহার ২৯-৩১ শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই—(১) যোগী সমুদায় বস্তুতে আত্মরূপী ব্রহ্মকে দেখেন এবং আত্মাতে সমুদায় বস্তু দেখেন। (২) এই দেখার ফল এই হয় যে ঈশ্বর কখনও সাধকের অদৃশ্য হন না এবং সাধক কখনও ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি হারান না। (৩) একত্ব আশ্রয় করিয়া তিনি ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপীরূপে ভজনা করেন, তিনি যে কোন অবস্থায়ই থাকুন্ না কেন সর্ব্বাবস্থায় তিনি ব্রহ্মেতেই বাস করেন। (৪) সাধক সকলের সুখ দুঃখকে নিজ সুখ ও নিজ দুঃখের মত দেখেন, অর্থাৎ অন্যের সুখে নিজেকে সুখী এবং অন্যের দুঃখে দুঃখী বোধ করেন। এরূপ সাধককেই গীতাকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়াছেন। "স যোগী পরমো মতঃ"।

অষ্টাদশ অধ্যায়

পরমত-খণ্ডন

এখন আমরা ব্রহ্মবাদের ন্যায়প্রস্থান 'ব্রহ্মসূত্রের' ভিতর কিঞ্চিৎ প্রবেশ করিতে চেষ্টা করি। এই গ্রন্থ 'সূত্র' প্রণালীতে অর্থাৎ অতি অল্পাক্ষর-যুক্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যাবলীর আকারে লিখিত হওয়াতে ইহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ পাঠকের পক্ষে অতীব কঠিন ব্যাপার হইয়াছে। ফলতঃ কোন না কোন ভাষ্যের সাহায্য গ্রহণ না করিলে ইহা বোঝা অসম্ভব। কিন্তু ভাষ্যকারদের মধ্যে বহুল মতভেদ। প্রত্যেকে নিজ নিজ মতানুসারে সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহা হউক্, তাঁহাদের শাব্দিক ব্যাখ্যার সাহায্যে অথচ দার্শনিক মত সম্বন্ধে অপক্ষপাতি চিত্তে সূত্রগুলি বুঝিতে চেষ্টা করিলে সূত্রকারের নিজমত আবিষ্কার করা অসম্ভব নহে। আমরা সেরূপভাবে তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার মত যাহা বুঝিয়াছি সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি। 'ব্রহ্মসূত্র' বিষয়ানুসারে চারি অধ্যায়ে বিভক্ত,—(১) সমন্বয়, (২) অবিরোধ, (৩) সাধন ও (৪) ফল। প্রত্যেক অধ্যায় আবার চারি চারি পাদে বিভক্ত। প্রথমাধ্যায়ের প্রায় সর্ব্বত্রই উপনিষদের শাব্দিক ব্যাখ্যা। বহুল ঔপনিষদ্

'ব্রহ্মসূত্রে' আলোচিত বিষয়

শব্দ, যাহা প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মবাচক, সে সকলকে ব্রহ্মবাদ-বিরোধীরা প্রকৃতি-বাচক বা জীব-বাচক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সূত্রকার তাঁহাদের ভুল দেখাইয়াছেন। দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে তিনি (১) সাংখ্য, (২) বৈশেষিক পরমাণুবাদ, (৩) সর্ব্বাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধ, (৪) বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ, (৫) জৈন (৬) নৈয়ায়িক ও অন্যান্য ঈশ্বরবাদ (৭) ভাগবত চতুর্ব্যূহবাদ, এই কয়েকটী ব্রহ্মবাদ-বিরোধী মতের ব্যাখ্যা ও খণ্ডন করিয়াছেন। খণ্ডনে তিনি শাস্ত্রীয় ও যৌক্তিক উভয়বিধ প্রমাণই প্রয়োগ করিয়াছেন। আমরা এই খণ্ডনের ভিতরে বিশেষভাবে প্রবেশ করিব না। আমরা ঔপনিষদ্ ব্রহ্মবাদ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া যে যুক্তিপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছি তাহা দৃঢ়রূপে ধরিলে এসকল ব্রহ্মবাদবিরোধী মতের ভ্রম সহজেই বোঝা যায়। সূত্রকারের পরমত-খণ্ডন সম্বন্ধে কেবল আমাদের বক্তব্য এই যে এসকল মতের মধ্যে যে দুটী মত সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, অর্থাৎ সাংখ্যমত ও বৌদ্ধ-মত, সে দুটীর খণ্ডন আরো সন্তোষকর হইত যদি সূত্রকার ঔপনিষদ্ আত্মবাদের ভিতর খুব গভীরভাবে প্রবেশ করিতেন। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী পাঠক দেখিবেন যে সূত্রকার এই দুটী মত খণ্ডন করিতে যাইয়া বস্তুতঃ লৌকিক দ্বৈতবাদের উপরই দাঁড়াইয়াছেন। জড় ও আত্মা এই দুটী স্বতন্ত্র বস্তু স্বীকার করিয়া তিনি সাংখ্যকে দেখাই-

তেছেন যে জগতে যে লক্ষ্য ও উপায়াত্মক বিচিত্র রচনা দৃষ্ট হয় তাহা কোন অচেতন শক্তির কার্য্য হইতে পারে না। অচেতন বস্তুতে শক্তি থাকিতে পারে না, ইহাও তিনি বলিয়াছেন বটে, কিন্তু একথা বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই। শক্তি বা কর্ত্তৃত্বের ধারণা আমরা আমাদের নিজ নিজ ইচ্ছার কর্ত্তৃত্ব দেখিয়া পাই। নিজ কর্ত্তৃত্ব, কার্য্য উৎপাদনের ক্ষমতা, লক্ষ্য না করিলে শক্তির কোন ধারণাই আমাদের হইত না, 'শক্তি' শব্দটার উৎপত্তিই হইত না। কিন্তু আমাদের কর্ত্তৃত্বের সহিত জ্ঞান অবশ্যম্ভাবীরূপে জড়িত। জ্ঞানছাড়া কর্ত্তৃত্ব বা শক্তি অর্থহীন। সুতরাং সাংখ্যের 'অচেতন জড়শক্তি' একটা কথার কথা মাত্র। যাহা হউক্, 'জড়বস্তু' যে প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরেরই রূপ, সূত্রকার তাহা শেষটায় স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সে বিষয়ে তিনি শাস্ত্রপ্রমাণ মাত্র দিয়াছেন, কোন যৌক্তিক প্রমাণের অবতারণা করেন নাই। ঈশ্বরের সগুণ বিশ্বরূপ স্বীকার করিয়াও তিনি সগুণ ভাবকে মায়িক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সুতরাং সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াও তিনি সাংখ্যপ্রভাবের অতীত হইতে পারেন নাই। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিতে যাইয়া তিনি বিচারশূন্য বাহ্যদৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক অনাত্ম বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা বলেন বিজ্ঞানের বাহিরে, বিজ্ঞানের অতিরিক্ত, কোন বস্তু নাই। এই কথা খণ্ডন করিতে যাইয়া সূত্রকার দেখাইতেছেন যে শরীরের বাহিরে যে বস্তু

আছে তাহা প্রত্যক্ষ ব্যাপার। ইহাতে বস্তুতঃ বিজ্ঞানবাদ খণ্ডিত হইল না। শরীর এবং শরীরের বাহিরের বস্তু, অর্থাৎ দেশস্থিত বস্তুমাত্রই যে বিজ্ঞানের অন্তর্গত, বিজ্ঞান-সাপেক্ষ, এই তত্ত্ব সূত্রকার ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক্, ক্ষণিক বিজ্ঞান-পরম্পরা যে কালাতীত আত্মার সাহায্য ব্যতীত স্থায়ী বস্তুতে পরিণত হইতে পারে না, তাহা সূত্রকার স্পষ্ট ভাবেই দেখাইয়াছেন। আমাদের ষষ্ঠাধ্যায়ে সে যুক্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে সূত্রকার আকাশ, আত্মা ও প্রাণ সম্বন্ধে কতিপয় জটিল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। এসকল বিষয়ে আমরা আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে কতক আলোচনা করিয়াছি, পরে আরও কিঞ্চিৎ করিব। তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদে কর্ম্মকাণ্ডের সাধকদের পিতৃযাণ পথে পিতৃলোক গমন এবং তথা হইতে সংসারে প্রত্যাগমন আলোচিত হইয়াছে এবং সংক্ষেপে জ্ঞানসাধকদিগের দেবযান গতিরও উল্লেখ করা হইয়াছে। এসকল বিষয় আমরা আমাদের বিংশ অধ্যায়ে সবিস্তার আলোচনা করিব। দ্বিতীয় পাদে জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ বিচারপূর্ব্বক ব্রহ্মের অভেদত্ব ও নির্গুণত্ব দেখান হইয়াছে। যুক্তিপ্রণালী অনেকটাই যাজ্ঞবল্ক্যের মত, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য আত্মাতিরিক্ত কোন বস্তু স্বীকার করেন নাই। সূত্রকার জড়বস্তু তো স্বীকার করেনই, আমাদের মন বুদ্ধিকেও জড়ের সূক্ষ্ম কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

এবিষয়ে আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে অনেক আলোচনা হইয়াছে; শেষ দুই অধ্যায়ে আরো কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে। তৃতীয় পাদে উপনিষদুক্ত বিদ্যা বা উপাসনা-সমূহের ভেদ ও সংগ্রহ সম্বন্ধে বিস্তর বিচার করা হইয়াছে এবং প্রসঙ্গক্রমে চার্ব্বাক দেহাত্মবাদ খণ্ডন করা হইয়াছে। চতুর্থ পাদে জ্ঞান ও কর্ম্ম, জ্ঞান-কর্ম্মের সমুচ্চয়বাদ এবং কর্ম্মহীন জ্ঞানবাদ বা সন্ন্যাস, এসকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সমুচ্চয়বাদী জৈমিনি এবং সন্ন্যাসবাদী বাদরায়ণের বিরোধ দেখাইয়া সূত্রকার মোটের উপর বাদরায়ণের পক্ষই সমর্থন করিয়াছেন। কর্ত্তৃত্বহীন নির্গুণ ব্রহ্ম স্বীকার করিলে পরিণামে কর্ম্মহীন সন্ন্যাস ও মোক্ষের পথই অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু আমরা মুক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া দেখাইব যে সূত্রকার মুক্তির ব্যাখ্যায় ভেদাভেদবাদী ঋষিদের পক্ষই অবলম্বন করিয়াছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে সূত্রকার শ্রবণ-মননাদি সাধন, অহংগ্রহ উপাসনা, প্রতীক উপাসনা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিয়া জীবন্মুক্তির অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে জীবন্মুক্তিতে ধর্ম্মাধর্ম্মের ভেদ থাকে না। জীব-ব্রহ্মের ভেদ অস্বীকার হইতেই এরূপ মত আসে। আমরা যথাস্থানে উপাসনাদি সাধন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি এবং ইহাও দেখাইয়াছি যে জীব-ব্রহ্মের ভেদ অস্বীকার করিলে সমস্ত সাধনশাস্ত্রই অর্থহীন হয়। এই আলোচনার আলোকে দেখিলে সহজেই

প্রতীতি হইবে যে সূত্রকারের বর্ণিত জীবন্মুক্ত জ্ঞানী, যিনি নির্ব্বাণমুক্তির প্রত্যাশায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন, তিনি বস্তুতঃ সর্ব্বপ্রকার ভেদের অতীত নহেন। যাহা হউক্, চতুর্থাধ্যায়ের শেষ তিন পাদে শরীর হইতে জীবাত্মার উৎক্রমণ, দেবযান পন্থা এবং মুক্তাত্মার স্বরূপ আলোচিত হইয়াছে। এসকল বিষয়ে আমরা আমাদের বিংশাধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করিব, সুতরাং এখানে সংক্ষেপে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। আমরা এই অধ্যায়ে ব্রহ্মসূত্রের সামান্য পরিচয় মাত্র দিলাম। বিশেষ পরিচয় পাইতে গেলে মুল গ্রন্থ পড়া আবশ্যক। প্রত্যেক পাদে আলোচিত বিষয়ের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠক আমাদের সম্পাদিত "ব্রহ্মসূত্রের" ইংরেজী ভাষ্যে পাইবেন।

উনবিংশ অধ্যায়

জীবাত্মার অমরত্ব

উপনিষদ্ দর্শন সাধন ও পরলোকতত্ত্বের ভিত্তি

আমরা আমাদের ষষ্ঠ ও সপ্তমাধ্যায়ে জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ সম্বন্ধ দেখাইয়াছি। যাহা দেশে বিস্তৃত, কালে প্রবাহিত, তাহারই নাম জগৎ। এই দেশ-কালস্থিত জগৎ দেশকালাতীত পরমাত্মার আশ্রিত। আশ্রয়রূপী পরমাত্মাকে ছাড়িয়া দেশ-কালস্থিত জগৎ ছিন্নসত্তা কল্পনামাত্র, প্রকৃত গোটা বস্তু নহে। সসীম জ্ঞান ও সসীম শক্তি-বিশিষ্ট আত্মাকেই আমরা জীবাত্মা বলি। কিন্তু অসীমকে ছাড়িয়া সসীম ভাবা যায় না; এরূপ আত্মাও ছিন্নসত্তা কল্পনামাত্র, প্রকৃত গোটা বস্তু নহে। জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের এই ভেদাভেদ-তত্ত্বই উপনিষদের মূল দর্শন এবং এই দর্শনের উপরই শাস্ত্রীয় সাধন-বিজ্ঞান এবং বেদবিরুদ্ধ পরমত-খণ্ডন প্রতিষ্ঠিত। আমরা আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমাদের সাধ্যানুসারে এই দর্শন, সাধন-বিজ্ঞান এবং পরমত-খণ্ডন-প্রণালী ব্যাখ্যা করিয়াছি। আমাদের বর্ত্তমান এবং পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা যে পরলোকতত্ত্ব ও মুক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিব সেই তত্ত্ব-দ্বয় শাস্ত্রীয় দর্শন ও সাধনতত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত। দর্শন ও সাধনে যাহারা অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত নহে,

যাহারা বালকের ন্যায় চিন্তা ও সাধন-বিহীন জীবন যাপন করে, তাহারা পরলোক ও অমরত্বের কথা বুঝিবে না, বুঝাইলেও বুঝিবে না।

"ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্
প্রমাদ্যন্তম্ বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে॥"

কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে বলিতেছেন,—"বালক (অর্থাৎ অবিবেকী), যে ধনমোহে আচ্ছন্ন, তাহার নিকট পরলোক প্রকাশিত হয় না। 'কেবল এই লোকই আছে, পরলোক নাই', এরূপ মনে করিয়া সে পুনঃ পুনঃ আমার বশবর্ত্তী হয়।" (২।৬)

যাহা হউক্, এখন অমরত্বের প্রমাণবিষয়ে মনোযোগ দেওয়া যাক্। পাঠক দেখিয়াছেন যে জীবাত্মার জ্ঞান ও শক্তি সীমাবিশিষ্ট বটে, কিন্তু সে পরমাত্মার অন্তর্গত, তাঁহার অংশীভূত, বলিয়া সেও কালাতীত, নিত্য। সে কালপ্রবাহের জ্ঞাতা, এবং জ্ঞাতা বলিয়াই উহার অতীত। সে বিস্মৃতি ও নিদ্রার অধীন, কিন্তু তাহার জ্ঞান সর্ব্বজ্ঞ অনিদ্র পুরুষের আশ্রিত বলিয়া সে বিস্মৃত বিষয় পুনরায় স্মরণ করে, সে নিদ্রাভঙ্গে পুনরায় জাগ্রত হয়। এই স্মরণ-জাগরণের ভিতরেই অমৃতত্বের রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। অবিবেকী এই রহস্যভেদ করিতে চেষ্টা

আত্মার নিত্যত্ব

করে না, তাই অমৃতত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে একান্ত অভিন্ন হইলে জ্ঞানের আবির্ভাব ও তিরোভাব, স্মৃতি-বিস্মৃতি ও নিদ্রা-জাগরণের দ্বন্দ্ব সম্ভব হইত না। সম্পূর্ণরূপে একক পরমাত্মাতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও এসকল ব্যাপার সম্ভব নহে। এই তত্ত্ব না বুঝিয়াই নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদী লয়বাদী হন, বস্তুতঃ জীবের অমৃতত্ব অস্বীকার করেন।

জীবলীলার অভিপ্রায়

যাহা হউক্, এই যে ব্রহ্মের আশ্রিত জীবলীলা, জ্ঞানাদি আধ্যাত্মিক সম্পত্তির আবির্ভাব-তিরোভাব, সাধনদ্বারা এ-সকল সম্পত্তির ক্রমোন্নতি ও সঞ্চয়, যে লীলা এক অর্থে ব্রহ্মের নিজস্ব নহে, অথচ যাহার মূলে তিনি,—নিজের অপ্রাপ্ত, প্রাপ্তব্য, কিছু না থাকিলেও যাহাতে তিনি ব্যস্ত রহিয়াছেন,—

"নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি" (গীতা ৩।২২)

এই জীবলীলা তো অনর্থক হইতে পারে না। ইহা যে অনর্থক নহে, ইহা যে জীবাত্মার প্রতি পরমাত্মার প্রেমসম্ভূত, তাহাও আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি। জগৎকে অর্থহীন, লক্ষ্যহীন, অনৈতিক, মনে করা, ইহা যে একটা ধর্ম্মচক্র তাহা না বোঝা, ইহা জীবের অমরত্ব অস্বীকারের আর একটা কারণ। যাহা হউক্, এই দুটা কথা,—(১) জীবাত্মা কাল-প্রবাহের অতীত, নিত্য পরমাত্মার অন্তর্গত; (২) ইহা পরমাত্মার প্রিয়, পরমাত্মা ইহার শ্রেয়সাধনে ব্যস্ত, এই দুটা

কথা স্মরণ রাখিলে জীবের অমরত্ব সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। মানব পিতা মাতা ঈশ্বরের কণামাত্র প্রেম পাইয়া সন্তানবিরহে ম্রিয়মাণ হন, সন্তানকে চিরদিন নিকটে রাখিতে চান, অথচ প্রেমের আধার প্রেমময় ঈশ্বর নিজ সন্তানকে লইয়া কিছু দিন খেলা করিয়া পরে মারিয়া ফেলেন,—এই কথা যাহারা বিশ্বাস করে তাহারা হয় নিজে অপ্রেমিক, অথবা প্রেমের প্রকৃত অর্থ ও গভীর মর্ম্ম বুঝে না। প্রেমের দুটী মূল লক্ষণ এবং দুটী লক্ষণই অমরত্বসূচক। (১) প্রেম চায় প্রিয়পাত্রকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিতে। ইহা প্রিয়পাত্রের বিচ্ছেদ ভাবিতে পারে না (২) ইহা চায় প্রিয়পাত্রের শ্রেয়-সাধন। ইহা শ্রেয় বা মঙ্গলের কোন শেষ বা সীমা ভাবিতে পারে না। মানুষ জ্ঞানে ও শক্তিতে সসীম বলিয়া সর্ব্বদা প্রিয় পাত্রকে কাছে রাখিতে পারে না এবং চিরদিন তাহার শ্রেয়সাধনে ব্যস্ত থাকিতে পারে না। অনন্তজ্ঞান, অনন্ত-শক্তি, প্রেমময় ঈশ্বর সম্বন্ধে একথা খাটে না। পরম পিতা পরম মাতা হইতে সন্তানের বিচ্ছেদ অসম্ভব এবং সন্তানের যাহা শ্রেয়, যে শ্রেয়-সাধনে তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত রহিয়াছেন, তাহারও কোন সীমা কল্পনা করা যায় না। তাঁহার ভাণ্ডারে অনন্ত জ্ঞান, শক্তি, পুণ্য, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য আছে। তিনি নিত্য কালই তাহা সন্তানকে দিবেন, এই তত্ত্বই তাঁহার পূর্ণ স্বরূপের সহিত সুসঙ্গত।

এখন, যে কারণে লোকের অমরত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, সে

বিষয়ে কিছু আলোচনা কর যাক্। জীবের শরীর ও আত্মার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ দেখিতে পাওয়া যায়।

দেহ-মনের স্বাতন্ত্র্য

মস্তিষ্ক, ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ড, পাকযন্ত্র, এসকলের স্বাস্থ্যে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে, এসকলের বিকলতায় মানসিক কার্য্য বিকল হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার উপর জ্ঞান ও শক্তির আবির্ভাব-তিরোভাব নির্ভর করে। শরীর-মনের এই ঘনিষ্ঠ যোগ দেখিয়া স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে 'শরীর নষ্ট হইলে আত্মা থাকিবে কিনা, আর যদি থাকেও, তাহার জ্ঞানলাভ ও কার্য্য করা কিরূপে সম্ভব হইবে?' বিষয়জগৎ ও আত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে আমরা এই গ্রন্থে যে মত ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা যাঁহারা জানেন না বা জানিয়াও স্বীকার করেন না, তাঁহারা শরীরনাশে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ করেন। তাঁহারা তথাকথিত জড়বস্তুকে একমাত্র সত্য বস্তু মনে করিয়া জড়শরীরের বিশ্লেষে আত্মারও বিশ্লেষ কল্পনা করেন। আমরা জড়বাদের ঠিক বিপরীত মতই সমর্থন করিয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি যে জড় একমাত্র বস্তু হওয়া দূরে থাক্, জড় বলিয়া কোন বস্তুই নাই। দেশকালস্থিত বিষয় বস্তুতঃ আত্মার আশ্রিত,—আত্মাই একমাত্র বস্তু; জীবাত্মা জড়ের কার্য্য হওয়া দূরে থাক্, ইহা সর্ব্বাধার সর্ব্বরূপী পরমাত্মারই অংশীভূত। এই মত বুঝিলে ও গ্রহণ করিলে জীবাত্মার বিনাশের কোন আশঙ্কাই থাকে না, বরঞ্চ দেখা যায়

পরমাত্মা যেমন অমর, ইহা তেমনই অমর, ইহা তাঁহারই অমরত্বে অমর, তাঁহারই নিত্যত্বে নিত্য। কিন্তু এই ভাবে জীবাত্মার অমরত্ব স্বীকার করিলেও শরীর মনের প্রভেদ দূর হয় না, এবং এই সন্দেহ নিরাকৃত হয় না যে শরীরের বিশ্লেষে জীবাত্মার সসীম প্রকাশ,—অনন্ত হইতে ভিন্নরূপে তাহার জ্ঞান ও কার্য্য—সম্ভব কি না? জীবাত্মা পরমাত্মার অংশীভূত হইলেও জগতের একটী ক্ষুদ্র অংশের সহিতই তাহার সাক্ষাৎ যোগ। মানবশরীর পরমাত্মার বিশ্বদেহের একটী অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। ইহার সাহায্যেই জীব বিশ্বের অন্যান্য ক্ষুদ্র অংশের সহিত পরিচিত ও সম্বদ্ধ হয়। সুতরাং উপনিষদের সর্ব্বাত্মবাদেও দেহ-মনের প্রভেদ যায় না এবং 'দেহাবয়বের বিনাশে মন কিরূপে নিজ জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি পরিচালিত করে?' এ প্রশ্নের অবসর থাকে। কিন্তু প্রশ্নটীর অবসর থাকিলেও ইহার প্রকৃতি অত্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। জড়বাদ একটা অন্ধ শক্তি কল্পনা করিয়া এবং ইহার উপরে সমুদায় জগৎ-কার্য্যের ভার আরোপিত করিয়া জীবন-মৃত্যুকে, বিশেষতঃ মৃত্যুকে, বিষম ভীতিময় করিয়া তুলে। উপনিষদের আত্মবাদে সেই ভীতি অসম্ভব করিয়া দেয়। জড়বাদীর মতে শরীর একটা অনাত্মবস্তু, ইহা মানসিক কার্য্যের কারণ বা নিত্য সঙ্গী। আত্মবাদে শরীর এবং জগতের সমস্ত বস্তুই পরমাত্মার রূপ। শরীরের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিশ্লেষ

সমস্তই ভগবানের সাক্ষাৎ কার্য্য। জন্ম, জীবন ও মৃত্যুকে এই ভাবে দেখিলে এসকল ঘটনার সহিত লৌকিক চিন্তা যে ভয় জড়িত করে, তাহা চলিয়া যায়। পক্ষান্তরে দেখুন, জীবের জীবন ঈশ্বরের জগৎকার্য্যের অংশীভূত হইলেও জগতের অধিকাংশ বস্তু ও কার্য্যের সহিত জীবাত্মা সাক্ষাৎভাবে অসম্পর্কিত। যাহার সহিত ইহার যেটুকু সম্পর্ক হয় তাহার সহিত ইহার সেই সম্পর্কও অস্থায়ী। বিশ্ব-কার্য্যের অধিকাংশই জীবের অপেক্ষা না রাখিয়া চলিতেছে। সুতরাং বিশ্বের সহিত জীবাত্মার একটা আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য আছে। অভেদবাদের সত্য দেখিতে গিয়া এই ভেদ, এই স্বাতন্ত্র্য, ভুলিয়া যাওয়া ঠিক নহে। যেমন সাধারণ বিশ্বের সহিত, তেমনি বিশ্বের অংশ জীবদেহের সহিতও, জীবাত্মার একটা স্বাতন্ত্র্য আছে যাহা অনেক সময়ই আমরা ভুলিয়া যাই। সেই স্বাতন্ত্র্যটা দেখিলে ও স্মরণ রাখিলে আমাদের বর্ত্তমান সমস্যা অনেকটা সহজ হইয়া যায়। বিশ্বাত্মা বিশ্বের কোন বস্তু বা কার্য্য ভুলিতে পারেন না, তাঁহার ভোলার কোন অর্থই নাই, কারণ তিনিই সর্ব্ববস্তুরূপী এবং সমগ্র বিশ্বকার্য্যই তাঁহার। কিন্তু তিনি তাঁহার অণুরূপী জীবাত্মাকে জগতের অনেক বস্তু ভুলিবার এবং অনেক কার্য্যের সহিত নিঃসম্পর্কিত থাকিবার অধিকার দিয়াছেন। ফলতঃ এই অধিকারেই জীবের জীবত্ব। শরীরের কথাই বিশেষভাবে বলি।

আমরা অনেক সময়ই শরীর ভুলিয়া থাকি এবং সেই অর্থে শরীর ছাড়িয়া থাকি, অথচ শরীরের কার্য্য অবাধে চলিতে থাকে। অন্নপরিপাক, রক্তসঞ্চালন, শরীরাবয়বের পুষ্টিসাধন ও ক্ষতিপূরণ, মানসিক কার্য্যের সহিত বিশেষ-রূপে সম্পর্কিত মস্তিষ্কেরও রক্ষণ-পোষণ, সমস্তই আমাদের মনোযোগ ও কর্তৃত্ব ছাড়া চলিতে থাকে। অপর দিকে, শরীরের কার্য্য পুর দমে চলার অবস্থাতেও মন কেবল আংশিকভাবে নহে, সময় সময় সম্পূর্ণভাবে, নিষ্ক্রিয় ও নিদ্রিত হইয়া পড়ে, শরীরের পূর্ণ স্বাস্থ্য ও অবাধ ক্রিয়াও তাহাকে জাগাইতে পারে না। ইহাতেই মনে হয় আত্মার জাগ্রৎ অবস্থার সহিত শরীরের সম্বন্ধ অবশ্যম্ভাবী নহে। কিন্তু এই বিস্মৃতি ও সুষুপ্তির সময়ে যে আত্মার পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞান ও শক্তি অব্যাহত থাকে, তাহা পুন-র্জাগরণে নিঃসন্দিগ্ধরূপেই প্রমাণ হয়। এই প্রমাণ একাধিকবার এই গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়জগতের সংশ্লেষ ছাড়াও যে আত্মা নিজশক্তিতে নানা বিষয় সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা যাজ্ঞবল্ক্য দেখাইয়াছেন এবং সকলেরই অভিজ্ঞতার বিষয়। আধুনিক সময়ে কোন কোন স্থলে, কোন কোন অবস্থায়, চক্ষুকর্ণাদির সাহায্য ব্যতীতও দর্শন-শ্রবণাদি হয়, এমন কি দূরদর্শন ও দূরশ্রবণও হয়, ইহাও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বিষয়। এখন দ্রষ্টব্য এই যে এসকল ব্যাপারে শরীর

হইতে জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্য প্রমাণিত হইতেছে। শরীর আত্মা উভয়ই ঈশ্বরাশ্রিত, কেহই তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নহে ; কিন্তু ইহারা পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র। ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু সেই সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য নহে, এমন ঘনিষ্ঠ নহে যে একেকে ছাড়িয়া অন্য থাকিতে পারে না। যিনি জীবাত্মাকে এই শরীর দিয়াছেন,—বলিতে গেলে তাহার শরীররূপে প্রকাশিত হইয়াছেন,—তিনি তাহাকে অন্য শরীর,—এই শরীরের অনুরূপ বা ইহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন শরীর,—দিতে পারেন এবং প্রয়োজন হইলে নিশ্চয়ই দিবেন। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্তে বলিলেই হয়, শরীর হইতে কতিপয় অণু বাহির হইয়া যাইতেছে এবং তাহাদের স্থানে নূতন অণু আসিতেছে। প্রতি তিন বৎসর সমগ্র শরীর পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কিন্তু ইহাতেও আত্মার একত্ব নষ্ট হয় না। কালের গতিতে আত্মার মানসিক সম্পত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আত্মজ্ঞানের একতা অব্যাহত থাকে। এই ব্যাপারে শরীর মনের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টতর হয় এবং এক দেহান্তে দেহান্তর প্রাপ্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়। পুনর্জ্জন্ম-বাদীরা বলেন এক দেহান্তে আমরা অন্য স্থূল দেহই পাইব। মধ্যসময়ে সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহে থাকিব। অধ্যাত্ম-বাদীরা (spiritualists) বলেন সূক্ষ্ম দেহই জ্ঞানলাভ ও কার্য্যের পক্ষে যথেষ্ট, স্থূল দেহের প্রয়োজন নাই অথবা প্রয়োজন হইলে আত্মা তাহা ধারণ করিতে পারে। উভয়

মতাবলম্বী বিজ্ঞ ও শ্রদ্ধেয় লোকদের লেখা এত কথা আমরা পড়িয়াছি যে কোন মতকেই অগ্রাহ্য করিতে পারি না, কিন্তু আমাদের জ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় এই দুই মতের কোন মতই নিশ্চিত বৈজ্ঞানিক সত্যের পদবীতে দাঁড়ায় নাই। নিশ্চিত সত্য,—যাহার প্রামাণ্য প্রত্যেকের আত্মজ্ঞানের সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে,—তাহা কেবল এই যে মানবাত্মার উন্নতি-স্রোত কখনও বন্ধ হইবে না, সূক্ষ্ম বা স্থূল দেহ ধারণ অথবা অন্য যে কোন বিধানেই হউক্, মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাহাকে অশেষ উন্নতির পথে পরিচালিত করিবেন, তাহাকে নিজের সহিত সজ্ঞান যোগে যুক্ত করিবেন এবং যোগযুক্ত উন্নত আত্মাসকলকে অনুন্নত আত্মাদিগের কল্যাণকার্য্যে নিযুক্ত রাখিবেন। এই তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেই সাধনচেষ্টা অবাধে চলিতে থাকে; পরলোকে আত্মা কিরূপে থাকে, তাহার পুনর্জন্ম হয় কি না, এসকল প্রশ্নের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত না হইলেও আধ্যাত্মিক জীবনের কোন ক্ষতি বা প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু প্রস্থানত্রয়ের সকল রচয়িতাই পুনর্জন্মবাদী, সুতরাং আমরা এস্থলে পুনর্জন্মের সম্ভাবনা অসম্ভাবনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

পুনর্জন্মবাদীদের মতে পুনর্জন্মের প্রয়োজন এই যে জীবের সঞ্চিত আধ্যাত্মিক সম্পত্তি পরমাত্মাতে অক্ষুণ্ণ থাকে বটে, কিন্তু সেই থাকা অব্যক্ত, অপ্রকাশিত। ইহার অভিব্যক্তি

বা প্রকাশের জন্য শরীর ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য আবশ্যক।

পুনর্জন্মবাদ

নিদ্রা-জাগরণের প্রভেদ দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হয়। দেহান্তর প্রাপ্ত না হইলে যে আত্মা বিনষ্ট হইবে তাহা নহে, উহা 'অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা,' স্বভাবতঃই অবিনাশী। কিন্তু দেহান্তর প্রাপ্ত না হইলে ইহা সুষুপ্তির ন্যায় অব্যক্ত অবস্থায়ই থাকিবে, শাস্ত্রীয় ভাষায় বলিতে গেলে,—ইহার কর্ম্মফল ভোগ হইবে না, আধুনিক ভাষায় বলিলে,—ইহার আধ্যাত্মিক উন্নতি বন্ধ থাকিবে। শাস্ত্রকারেরা বলেন ইহার বাসনা কামনা অবশ্যম্ভাবীরূপেই ইহাকে পুনর্জন্মের দিকে লইয়া যাইবে, ইহার জন্য নূতন শরীর গড়িবে। আমরা এই ভাষা ব্যবহার না করিয়া, কিন্তু ইহারই সারমর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, বলিতে পারি,—জীবের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম, জীবের কল্যাণ সম্বন্ধে ভগবদিচ্ছা, ইহাকে চিরনিদ্রিত না রাখিয়া ইহার ক্রমোন্নতির অনুকূল দেহ সৃষ্টি করিবে। মানুষ মা সন্তানকে ঘুম পাড়ান, কিন্তু সন্তান বেশী ক্ষণ ঘুমাইলে অস্থির হইয়া পড়েন। ইহার সাময়িক নিদ্রা ইহার মঙ্গলের জন্য আবশ্যক, কিন্তু অতি দীর্ঘ নিদ্রা আবশ্যকও নহে, মায়ের পক্ষে আনন্দজনকও নহে। শিশুর হাসি, খেলা এবং অস্ফুট ও ক্রমশঃ স্ফুটন্ত কথাবার্ত্তাই মায়ের আনন্দদায়ক। মানুষ মায়ের সম্বন্ধে যাহা সত্য, জগন্মাতার সম্বন্ধে তাহা কি অনন্ত গুণে অধিক সত্য নহে? তিনি সন্তানকে চিরনিদ্রিত করিয়া তাহার সঞ্চিত আধ্যাত্মিক

সম্পত্তি নিষ্ফল করিয়া দিবেন, ইহা কি কখনও সম্ভব? সুতরাং বিদেহ আত্মার অভিব্যক্তি ও উন্নতির জন্য যদি স্থূল দেহের প্রয়োজন হয় তবে নিশ্চয়ই তাহার পুনর্জন্ম হইবে। কিন্তু পুনর্জন্ম-বিরোধীরা বলেন, 'আত্মার পুনর্জন্ম হইলে, বর্দ্ধিত আত্মা পুনরায় শিশু হইলে, তাহার এজন্মের সমস্ত আধ্যাত্মিক সম্পত্তি তো নষ্টই হইল, তাহাকে আবার প্রথম হইতে শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইল।' পুনর্জন্মবাদীরা একথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন প্রত্যেক জন্মের অর্জ্জিত শিক্ষা মানসিক শক্তির আকারে সঞ্চিত হয় এবং পরজন্মে সেই আকারেই পুনঃ প্রকাশিত হয়। সেই জন্যই শিশুদের মধ্যে শক্তির তারতম্য দেখা যায়; কাহারো উন্নতি শীঘ্র হয়, কাহারো বিলম্বে হয়। 'কিন্তু পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি পরজন্মে পুনঃ প্রকাশিত না হইলে, বিশেষতঃ পূর্ব্বজাত ও পরজাত আত্মার একত্ববোধ না হইলে, কিরূপে উন্নতি সম্ভব'? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে এই জন্মেও যেমন স্মৃতির আবির্ভাব তিরোভাব হয়, সমগ্র স্মৃতি এক কালে প্রকাশিত থাকে না, এমন কি সুষুপ্তিতে সমস্ত স্মৃতিই, আত্মস্মৃতি পর্য্যন্ত, তিরোহিত হয়, এবং পুনরায় প্রয়োজন মত প্রকাশিত হয়, জন্মান্তর সম্বন্ধেও এই কথা ঠিক। জীবের সঞ্চিত সমস্ত স্মৃতি ও শক্তি সর্ব্বজ্ঞ পুরুষে সঞ্চিত থাকে, জন্মান্তরে পুনঃ প্রকাশিত হয়। পুনর্জাত শিশুতে শক্তির প্রকাশ স্পষ্টই দেখা যায়। সম্ভবতঃ কতক স্মৃতিরও প্রকাশ হয়, ভাষার অভাবে শিশু তাহা

প্রকাশ করিতে পারে না। কোন কোন বিশেষ শক্তিশালী শিশু ভাষা শিখিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা প্রকাশ করে। অনেক স্থলেই বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন অভিজ্ঞতাতে সেই স্মৃতি আচ্ছন্ন হইয়া যায়।* কোন কোন স্থলে বয়স্থ লোকের মধ্যে পুনর্জন্মের স্মৃতির উদয় হয়। তাহার কারণ সম্ভবতঃ পুনর্জন্মের সহিত সম্পর্কিত কোন বস্তু দেখা বা কোন কথা শোনা। ভাবযোগের (association of ideas) নিয়মানুসারে সেই দেখাশোনা পুর্ব্বজন্মের স্মৃতি টানিয়া আনে। সুতরাং পুনর্জন্ম সম্বন্ধে আপত্তিগুলি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না, অন্ততঃ এসকল যুক্তি পুনর্জন্মকে অসম্ভব বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে না। সমগ্র ব্যাপারটাতে অস্পষ্টতা যথেষ্টই আছে। সেই অস্পষ্টতা মানবজ্ঞানের সমস্ত বিভাগেই আছে। যেমন অন্য বিভাগে তেমনি অধ্যাত্ম রাজ্যে নিশ্চিত জ্ঞান দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকিয়া অস্পষ্ট বিষয় সম্বন্ধে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক জ্ঞান লাভের চেষ্টা করিতে হইবে।

সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ দেহ সম্বন্ধে আমরা এই অধ্যায়ে কিছু বলিলাম না, পর-অধ্যায়ে বলিব।

* "At length the man perceives it die away,
And fade into the light of common day."
Wordsworth's *Ode on the Intimations of Immortality.*

বিংশ অধ্যায়

জীবের চরমাবস্থা

উপনিষদের কোন কোন স্থল পড়িলে স্পষ্টই বোধ হয় পরলোক সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রথমে স্থির বিশ্বাস ও স্পষ্ট ধারণা ছিল না, কিন্তু ক্ষত্রিয়দের ছিল, এবং ক্ষত্রিয় শিক্ষকদের নিকট হইতেই ব্রাহ্মণেরা শিষ্যরূপে পরলোকতত্ত্ব লাভ করেন। ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিলাম তাহা কেবল যাগযজ্ঞাদিতে ব্যস্ত সাধারণ ঋত্বিক্‌দের সম্বন্ধেই খাটে, এমন নহে; তাহা সুবিজ্ঞ ব্রহ্মর্ষিদের সম্বন্ধেও সত্য। উদ্দালক আরুণি ছান্দোগ্যের ষষ্ঠাধ্যায়ে "তৎ ত্বমসি" মহাবাক্যের দীর্ঘ ব্যাখ্যা দিতে গিয়া মৃত্যুর কথা যথেষ্ট বলিয়াছেন, কিন্তু পরলোক সম্বন্ধে একটী কথাও বলেন নাই। তদীয় শিষ্য মহর্ষিপ্রবর যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণের দুটী বিবৃতিতেই এবিষয়ে নীরব। জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদের শেষ ভাগে এই অভাব পূরণ হইয়াছে বটে, কিন্তু সেস্থলেও পরলোকের বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত এবং যাহা আছে তাহাও পশ্চাৎ-চিন্তা (after-thought) বলিয়া বোধ হয়। রাজর্ষিরা ব্রাহ্মণ-চিন্তার এই অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। তাঁহারা উপনিষদের নানা স্থানেই এই অভাব পূরণ করিতে

পরলোকতত্ত্ব-ব্যাখ্যায় রাজর্ষিদের প্রাধান্য

চেষ্টা করিয়াছেন। পরলোক সম্বন্ধে সন্দেহ ও অস্পষ্টতার মূল নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ। ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদে সেই মূল ছেদন করা হইয়াছে। এই দেবর্ষিদ্বয়ের পশ্চাতে এক বা একাধিক রাজর্ষিকে দণ্ডায়মান বলিয়া বোধ হয়। নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। পরলোক সম্বন্ধে তিনটী আখ্যায়িকাতেই বক্তা এক জন রাজর্ষি এবং শ্রোতা এক জন ব্রহ্মর্ষি। শ্রোতা অন্য কেহ নহেন, নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদের আবিষ্কারক বা প্রথম ব্যাখ্যাকার এবং পরলোক সম্বন্ধে নীরব উদ্দালক আরুণি। তিনটী আখ্যায়িকার মধ্যে বর্ণনাভেদ অনেক, কিন্তু মূল কথা একই,—জীবাত্মার অমরত্ব ও পরলোক-বাস। প্রথম আখ্যায়িকাটী আছে ছান্দোগ্যের পঞ্চমাধ্যায় ৩-১০ খণ্ডে। ইহাতে বক্তা রাজর্ষি প্রবাহণ জৈবলি। আরুণিপুত্র শ্বেতকেতুকে তিনি পরলোক সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শ্বেতকেতু সেগুলির উত্তর দিতে পারেন নাই। দিবেন কি রূপে? আরুণি তো তাঁহাকে সেসকল বিষয়ে কিছুই শিক্ষা দেন নাই (ছান্দোগ্যের ষষ্ঠাধ্যায়ে)। শ্বেতকেতু বাড়ী ফিরিয়া গিয়া তাঁহার শিক্ষার অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে অভিযোগ করাতে আরুণি স্বীকার করিলেন যে তিনি নিজেই সেসকল বিষয়ে কিছু জানেন না। তিনি প্রবাহণের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াই সেসকল শিক্ষা করিলেন। দ্বিতীয় আখ্যায়িকাটী আছে বৃহদারণ্যক ষষ্ঠাধ্যায় দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে। ইহা ছান্দোগ্যের আখ্যায়িকারই

পরিবর্ত্তিত আকার। তৃতীয় আখ্যায়িকাটী আছে কৌষী-তকির প্রথমাধ্যায়ে। ইহাতে বক্তা প্রবাহণ নহেন, রাজর্ষি চিত্র; কিন্তু শ্রোতা সেই একই, উদ্দালক আরুণি, এবং উপলক্ষ্যও এক,—শ্বেতকেতুর অসম্পূর্ণ শিক্ষা। আরুণি ও শ্বেতকেতু যে রাজার পুরোহিত, তাহা এই আখ্যা-য়িকাতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে। আখ্যায়িকাগুলির ঐতি-হাসিকতা সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না। কিন্তু মোটের উপর এগুলির ঐতিহাসিকতা এতটুকু আছে বলিয়া বোধ হয় যে পরলোক সম্বন্ধে ব্রহ্মর্ষিদের চিন্তার অসম্পূর্ণতা দেখিয়া রাজর্ষিরা দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং সেই অসম্পূর্ণতা নানা প্রকারে দূর করিতে চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। সেই চেষ্টার প্রণালীটাও লক্ষ্য করিবার যোগ্য। নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদের গুরু আরুণিকে তাঁহার ক্ষত্রিয় যজমানের চরণতলে বসাইয়া তাঁহার ভ্রম বা অজ্ঞানতা দূর করা হইয়াছে। প্রথম দুটী আখ্যায়িকাতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে আলোচ্য তত্ত্ব পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদের জানা ছিল না, ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতেই তাঁহারা ইহা শিখিয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা প্রাচীন শাস্ত্রের অনেক স্থলে হস্তক্ষেপ করিয়া নানা ওলট্ পালট্ করিয়াছেন। কিন্তু এসকল আখ্যা-য়িকা তাঁহাদের অজ্ঞতা-জ্ঞাপক হইলেও এগুলির উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইহাতেই বোধ হয় এসকল আখ্যায়িকা মূলে ঐতিহাসিক,—এত দূর ঐতিহাসিক যে

এগুলির উপর হস্তক্ষেপ করিলে হস্তক্ষেপকারী উপহাসাস্পদ হইতেন। যাহা হউক্, এই তিনটী আখ্যায়িকার অবান্তর কথাগুলি ছাড়িয়া দিয়া আমরা মূলতত্ত্বটীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। কৌষীতকির আখ্যায়িকাটীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমরা প্রধানতঃ সেটী অবলম্বন করিয়াই এবিষয়ের আলোচনা করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ব্রহ্মর্ষিদের ব্যাখ্যাত সদ্যোমুক্তির কথা শোনা আবশ্যক। যাজ্ঞবল্ক্য

'সদ্যোমুক্তি'

বৃহদারণ্যকের চতুর্থাধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণে পরলোক ও মুক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"তদেষ শ্লোকো ভবতি। 'তদেব শক্তঃ সহকর্ম্মণৈতে লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য। প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎকিঞ্চেহ করোত্যয়ম্॥' তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণ ইতি নু কাময়মানোঽথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকাম ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি। ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।"—"সেবিষয়ে এই শ্লোক আছে,—'পুরুষের লিঙ্গস্বরূপ মন যে বিষয়ে আসক্ত, আত্মা সেই বিষয়েই আকৃষ্ট হইয়া নিজ কর্ম্মসহ সেই দিকে গমন করে'। এই লোকে পুরুষ যে কর্ম্ম করে, সে (স্বর্গাদিলোকে) তাহার ফল লাভ করিয়া সেই লোক হইতে এই কর্ম্মলোকে পুনরায় আগমন করে। কামনাবান্ পুরুষের বিষয়ে এই প্রকার। এখন কামনাবিহীন পুরুষের বিষয় (উক্ত হইতেছে),—যে পুরুষ অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম, আত্ম-

কাম, তাঁহার প্রাণ উৎক্রমণ (অর্থাৎ শরীরের বাহিরে গমন) করে না। তিনি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন” (৪।৪৬)। এই ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা উপনিষদের নানা স্থানে উক্ত হইয়াছে। উপনিষদ্-ব্যাখ্যায়ক কোন কোন আচার্য্য ইহাকে ‘সদ্যোমুক্তি’ বা ‘পরামুক্তি’ বলিয়াছেন। প্রশ্ন ও মুণ্ডক উপনিষদ্ হইতে আমরা এবিষয়ে দুটী উজ্জ্বল বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি। প্রশ্নোপনিষদের ষষ্ঠ প্রশ্নে ঋষি পিপ্পলাদ ভরদ্বাজপুত্র সুকেশাকে বলিতেছেন,—“স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে। এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষোঽকালোঽমৃতো ভবতি।”—“সেবিষয়ে দৃষ্টান্ত এই,—যেমন প্রবহমাণা ও সমুদ্রাভিমুখিনী নদীসমূহ সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে অস্ত যায় (অর্থাৎ বিলীন হয়) এবং তাহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয়, তখন কেবল সমুদ্রই বলা যায়, তদ্রূপ এই জীবরূপ পরিদ্রষ্টার পরম পুরুষের প্রতি গমনশীল এই ষোড়শকলা সেই পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে বিলীন হয়, তাহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয়, তখন কেবল পুরুষমাত্রই বলা যায়; এবং তিনি কলারহিত ও অমর হন” (৬।৫)। মুণ্ডকোপনিষদে প্রায় অনুরূপ ভাষায়ই বলা হইয়াছে,—

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা
দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু।
কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা
পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি॥
যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে-
ঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষম্ উপৈতি দিব্যম্।

—"তাঁহাদের (অর্থাৎ মুক্ত পুরুষদের) পঞ্চদশ কলা তাহাদের কারণসমূহে চলিয়া যায়। দেবগণ স্ব স্ব মূল দেবতাতে চলিয়া যান। তাঁহাদের কর্ম্ম এবং বিজ্ঞানময় আত্মা, এসকল পরাৎপর অব্যয় পুরুষের সহিত একীভূত হয়। যেমন প্রবহমাণা নদীসমূহ নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অস্ত যায়, তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তি নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন" (৩।২।৮)। প্রথম শ্লোকের কয়েকটী কথা ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। 'পঞ্চদশ কলা' = পঞ্চপ্রাণ ও দশেন্দ্রিয়। তাহা-দের 'প্রতিষ্ঠা' = যে সকল ভৌতিক বস্তুতে তাহারা নির্ম্মিত। 'দেবাঃ' = যে সকল দৈবী শক্তি ইন্দ্রিয়গণকে সাহায্য করে। 'প্রতিদেবতা' = ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবগণ যাঁহাদের শক্তি চক্ষু শ্রোত্রাদিকে সাহায্য করে। 'বিজ্ঞানময় আত্মা' = মন, বুদ্ধি ও অহংকারযুক্ত জীবাত্মা। একই

শক্তি কার্য্যভেদে মন, বুদ্ধি, অহংকার এই তিন নামে অভিহিত হয়। পঞ্চদশ কলার সহিত এই শক্তিকে যোগ করিলেই প্রশ্নোপনিষদের 'ষোড়শ কলা' হয়। এখন বোধ হয় পাঠক সদ্যঃ বা পরা মুক্তি ব্যাপারটী স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছেন। ইহার পশ্চাতে একটি দার্শনিক মত আছে। সেটী এই,—প্রত্যেক জীবাত্মার 'নামরূপ' অর্থাৎ যাহাতে সে অন্য জীবাত্মা ও পরমাত্মা হইতে ভিন্ন হয়, তাহা এই ষোড়শ কলাতে নির্ম্মিত। নির্ম্মাণের উপাদান ভৌতিক,—সাংখ্যমতে প্রকৃতির বিকার, মায়াবাদী বৈদান্তিক মতে মায়া বা অবিদ্যার ফল। যে ভাবেই দেখা যাক্, 'নামরূপ' বা 'ষোড়শ কলা' বিনাশশীল, মুক্তির অবস্থায় থাকে না। নামরূপেই যখন জীবের জীবত্ব, তখন নামরূপের বিনাশে জীব বিনষ্ট হয়, সেই অবস্থায় তাহাকে 'অকল', 'অমৃত' প্রভৃতি বিশেষণে বিশিষ্ট করা কবিত্ব মাত্র, ইহাতে লোক প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে ভ্রমে পড়ে। যাহা হউক্, এই 'সদ্যোমুক্তি' ব্রহ্মসূত্রকার তাঁহার তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যদিও তিনি ইহাকে এই নাম দেন নাই, 'স্বাপ্যয়' বা 'ব্রহ্মসম্পত্তি' বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে জীবন্মুক্তির অবস্থায় অবিদ্যা,—যাহা 'কারণশরীর,' লিঙ্গ ও স্থূল শরীরের কারণ,—তাহা বিনষ্ট হইলে জ্ঞানী দেখেন যে তিনি অশরীরী, কারণ যাহা মিথ্যা তাহা জ্ঞানে বিনষ্ট হয়। তবুও যে শরীর

আছে বলিয়া বোধ হয় তাহা কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল। ভোগদ্বারা এই ফল বিনষ্ট হইলেই তাঁহার মুক্তি বা 'ব্রহ্ম-প্রাপ্তি' পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। তাঁহাকে পিতৃযাণ বা দেবযান, কোন পথেই চলিতে হয় না।

'ক্রম-মুক্তি'

এই যে মুক্তিবাদ ব্যাখ্যা করিলাম, প্রজাপতি ও ইন্দ্র এই দেবর্ষিদ্বয় এবং প্রবাহণ ও চিত্র এই রাজর্ষিদ্বয় ইহার বিরোধী। ইঁহারা কুত্রাপি এই মুক্তির কথা বলেন না; ইঁহারা পুনর্জন্ম এবং আচার্য্যেরা যাহাকে 'ক্রম-মুক্তি' বলেন তাহাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে যাঁহারা ইষ্ট, পূর্ত্ত ও দত্ত, অর্থাৎ যজ্ঞ, বাপী-কূপ-খননাদি লোকহিতকর কার্য্য এবং উপযুক্ত পাত্রে দান, এসকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন নাই, তাঁহারা পিতৃযাণ পথে চলিয়া স্বর্গাদি পিতৃলোকে যান এবং তাঁহাদের পুণ্যফল ক্ষয় হইলে পূর্ব্বের কর্ম্মানুসারে নানা যোনিতে পুনর্জাত হন। পক্ষান্তরে যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, কিন্তু যাঁহাদের অবিদ্যা সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই, তাঁহারা দেবযান পথে চলিয়া ব্রহ্মলোকে উপনীত হন এবং তথায় চিরবাস করেন, তাঁহাদিগকে আর সংসারে ফিরিতে হয় না।

এবিষয়ে বিশেষ আলোচনার পূর্ব্বে তিনটী প্রশ্ন উঠি-তেছে,—(১) পিতৃলোক ও ব্রহ্মলোক কি আকাশে বিস্তৃত কোন স্থান, যাহা পৃথিবী হইতে অল্পাধিক দূরে অবস্থিত,

না আত্মার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র ? (২) পিতৃযাণ ও দেবযান কি অল্পাধিক দীর্ঘ কোন পথ, না দুটী সাধন-পন্থামাত্র ? (৩) যে লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীরে আত্মা কথিত পথদ্বয়ে চলিয়া কথিত লোক-দ্বয়ে যায়, সেই শরীর কি দেশব্যাপ্ত শরীর, যাহা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে, না জ্ঞানময় আত্মামাত্র যাহার কোন দেশব্যাপ্ত আকার নাই ? উপনিষদে এবং অন্য প্রস্থান-দ্বয়েও এসকল প্রশ্ন উঠে নাই এবং প্রশ্নগুলির কোন স্পষ্ট উত্তরও নাই; কিন্তু এসকল শাস্ত্রে এমন কতিপয় ইঙ্গিত আছে যে গুলির অনুসরণ করিলে এসকল প্রশ্নের সন্তোষকর উত্তরে উপনীত হওয়া যায়। চিন্তাহীন সাধারণ পাঠকের কাছে ইহাই বোধ হয় যে ঋষিরা বিশেষ বিশেষ গম্য স্থান ও পথের কথাই বলিয়াছেন এবং গন্তাও বিশেষ অবয়বযুক্ত আত্মা। ব্যাখ্যাকারগণও,—কেবল অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব্যাখ্যাকার নহেন, ব্রহ্মসূত্রকারের মত প্রাচীন ব্যাখ্যাকারও,—এরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। অবৈজ্ঞানিক যুগে এরূপ ব্যাখ্যা সহজেই গৃহীত হইত। বিশ্বাস-প্রবণতা তখন অধিক ছিল এবং বিষয়-জগতের, বিশেষতঃ পৃথিবী হইতে দূরে স্থিত দ্যুলোকের, জ্ঞান তখন অতি অল্পই ছিল। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে পিতৃলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি দেশগত জগতের কথা লোককে,—বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত লোককে,—বিশ্বাস করান বড়ই কঠিন। বিশ্বাস না করার আরো বিশেষ কারণ এই যে

পিতৃযাণ ও দেবযান; পিতৃলোক ও ব্রহ্মলোক

চন্দ্র ও সূর্য্য, যাহারা শাস্ত্রোক্ত পিতৃলোক ও ব্রহ্মলোকের সহিত সম্পর্কিত, তাহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জীবের বাসের পক্ষে নিতান্তই অনুপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যাহা হউক্, পন্থাদ্বয় ও লোকদ্বয় যে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক বস্তু, আত্মার সাধনপন্থা এবং প্রাপ্য অবস্থা, এবং ইহাই যে ঋষিদের অভিপ্রেত, তাহা দেখাইবার পূর্ব্বে লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম-দেহের কথাই অগ্রে বিচার করা যাক্।

লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম দেহ

প্রাণ অর্থাৎ চৈতন্য, জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ জানিবার শক্তি, কর্ম্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ কার্য্য করিবার শক্তি, মন অর্থাৎ নানাবিধ জ্ঞান ও কর্ম্মের একত্ব বা সমষ্টি, বুদ্ধি অর্থাৎ বোঝা, এবং অহংকার অর্থাৎ 'আমি'বোধ, —এসকল লইয়াই সূক্ষ্ম শরীর। কিন্তু এসকলই তো আত্ম-জ্ঞানের আশ্রিত। আত্মজ্ঞান না থাকিলে তো এসকল কিছুই সম্ভব নহে। এসমস্তই আত্মার স্বরূপের অন্তর্গত। তবে আর এসমুদায়কে কোন অনাত্ম অচেতন বস্তুর বিকার বলার কি অর্থ হইতে পারে? এগুলি স্থূল শরীরের বিশ্লেষে বিনষ্ট হওয়া, অথবা অবিদ্যানাশে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত ও তিরোহিত হওয়া, কিছুই তো সম্ভব নহে।

যাহা হউক্, এখন পন্থাদ্বয় ও লোকদ্বয় সম্বন্ধে রাজর্ষি প্রবাহণের কথা শোনা যাক্। পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ব্যাখ্যা করিয়া তিনি দেবযান পথ ও ব্রহ্মলোক সম্বন্ধে বলিতেছেন,—"তে য এবম্ এতদ্ বিদু র্যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যং উপাসতে

তে ঽর্চিরভিসম্ভবন্ত্যর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষম্ আপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষণ্মাসানুদঙ্ঙাদিত্য এতি মাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকাদাদিত্যম্ আদিত্যাদ্বৈদ্যুতং তান্ বৈদ্যুতান্ পুরুষো মানস এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি। তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি। তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ"।—"যাঁহারা এই বিদ্যা জানেন তাঁহারা এবং যাঁহারা অরণ্যে সত্যভাবে শ্রদ্ধা সাধন করেন তাঁহারা অর্চ্চিতে গমন করেন। সেই অর্চ্চি হইতে তাঁহারা দিনে, দিন হইতে বৃদ্ধিশীল পক্ষে অর্থাৎ শুক্ল পক্ষে, শুক্ল পক্ষ হইতে সূর্য্যের উত্তরায়ণের ছয় মাসে, মাসসমূহ হইতে দেবলোকে, দেবলোক হইতে আদিত্যে, আদিত্য হইতে বিদ্যুৎলোকে গমন করেন। তখন এক মনোময় পুরুষ (ছান্দোগ্যে 'অমানব পুরুষ') আগমন করিয়া বিদ্যুল্লোকপ্রাপ্ত মানবদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। তাঁহারা সেই ব্রহ্মলোকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া চিরকাল বাস করেন। সেস্থল হইতে আর তাঁহাদিগের পুনরাবর্ত্তন হয় না" (বৃহ ৬।২।১৫)। তৎপরে পিতৃযাণ পথ ও পিতৃলোক সম্বন্ধে বলিতেছেন,—"অথ যে যজ্ঞেন দানেন তপসা লোকাঞ্জয়ন্তি (ছান্দোগ্যে 'ইষ্টাপুর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে') তে ধুমমভিসম্ভবন্তি ধুমাদ্ রাত্রিং রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষম্ অপক্ষীয়মাণপক্ষাদ্ যান্ ষণ্মাষান্ দক্ষিণাদিত্য এতি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাচ্চন্দ্রং তে চন্দ্রং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি তাংস্তত্র দেবা যথা

রাজর্ষি প্রবাহণের পন্থাদ্বয় ও লোকদ্বয়-বর্ণনা

সোমং রাজানম্ আপ্যায়স্বাপক্ষীয়স্বেত্যেবমেনাং স্তত্র ভক্ষয়ন্তি তেষাং যদা তৎপর্য্যবৈত্যথেমমেবাকাশম্ অভিনিষ্পদ্যন্ত আকাশাদ্ বায়ুং বায়োর্বৃষ্টিং বৃষ্টেঃ পৃথিবীং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি তে পুনঃ পুরুষাগ্নৌ হূয়ন্তে ততো যোষাগ্নৌ জায়ন্তে লোকান্ প্রত্যুত্থায়িনস্ত এবমেবানুপরিবর্ত্তন্তেঽথ য এতৌ পন্থানৌ ন বিদুস্তে কীটাঃ পতঙ্গা যদিদং দন্দশূকম্।”—“আর যাহারা যজ্ঞ, দান ও তপস্যা দ্বারা (স্বর্গাদি) লোকসমূহ জয় করে, তাহারা ধূমে গমন করে, ধূম হইতে রাত্রিতে, রাত্রি হইতে ক্ষয়শীল অর্থাৎ কৃষ্ণ পক্ষে, কৃষ্ণ পক্ষ হইতে সূর্য্যের দক্ষিণায়ণের ছয় মাসে, মাসসমূহ হইতে পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে চন্দ্রলোকে গমন করে। তাঁহারা চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া অন্ন হয়। যেমন যজমান বৃদ্ধিশীল ও ক্ষয়শীল সোমরাজাকে (অর্থাৎ পার্থিব সোমলতার রসকে) পান করে, তেমনি দেবগণ (সোমলোকে অন্নরূপে পরিণত) মানবকে ভক্ষণ করেন (অর্থাৎ তাহাদের দর্শনে আনন্দিত হন)। যখন তাহাদের কর্ম্ম ক্ষয় হয়, তখন তাহারা এই আকাশকে প্রাপ্ত হয়; আকাশ হইতে বায়ুতে, বায়ু হইতে বৃষ্টিতে, বৃষ্টি হইতে পৃথিবীতে গমন করে। পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়া তাহারা (ব্রীহিযবাদির সংশ্রবে) অন্ন হয়। তাহারা পুনর্ব্বার পুরুষাগ্নিতে আহূত হয় এবং যোষাগ্নিতে জন্মগ্রহণ করে। (আবার) তাহারা বিভিন্ন লোকের অভিমুখে গমন করিয়া এই রূপে বারংবার আবর্ত্তন করে। যাহারা এই উভয় পথের কোন

পথই প্রাপ্ত হয় না, তাহারা কীট, পতঙ্গ ও দংশ মশকাদি-রূপে জন্মগ্রহণ করে” (বৃহ ৬।২।১৬)।

এখন, আমাদের অনুমান এই যে উল্লিখিত বিবৃতি আধ্যাত্মিক ব্যাপারের ভৌতিক রূপক মাত্র। পিতৃযাণ পথ আর কিছুই নহে, পূর্ব্বপুরুষদের প্রবর্ত্তিত যজ্ঞাদি সাধন অনুসরণ করা। ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, এ সমস্তই অজ্ঞতার রূপক। স্বর্গাদি পিতৃলোকও আর কিছুই নহে, এরূপ অন্ধানুসরণে ইহ-পরলোকে যে সুখ দুঃখ, লাভ ক্ষতি হয় তাহারই ভোগমাত্র। পুনঃ পুনঃ জন্মের অর্থ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা লাভ না করিয়া পুনঃ পুনঃ সাংসারিক জীবনে অর্থাৎ অজ্ঞানতা ও ক্ষুদ্রবাসনাময় জীবনে ফিরিয়া আসা। পুনর্জন্ম অসম্ভব নহে, কিন্তু মানবাত্মার মানসিক শক্তি নিম্নশ্রেণীর প্রাণী হইতে এত উচ্চ, যে গর্হিত পাপ কর্ম্মেও মানবের পক্ষে এসকল প্রাণীর পদবীতে যাওয়া সম্ভব বোধ হয় না। যাহা হউক্, দেবযানপথ ও ব্রহ্মলোক সম্বন্ধে আমাদের অনুমান আরো স্পষ্ট বোধ হয়। ‘দেবযান’ অর্থ দেবতাদের অর্থাৎ জ্ঞানী ও শুদ্ধ আত্মাদের অনুসৃত ও প্রদর্শিত পথ। অর্চ্চি, দিন, শুক্লপক্ষ, এসমস্তই জ্ঞান ও পুণ্যলোকের রূপক। উপনিষদের ব্যাখ্যাকারগণ, বিশেষতঃ ব্রহ্মসূত্রকার, বলেন যে আত্মা অর্চ্চিরাদি বস্তু ও কাল প্রাপ্ত হয়, ইহার অর্থ এসকল বস্তুও কালের অভিমানিনী বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অর্থাৎ যে দেবতারা এই সমুদায়কে

রাজর্ষি চিত্রের ব্রহ্মলোক-বর্ণনা

পরিচালিত করেন, তাঁহাদের নেতৃত্ব লাভ। এই দেবতারাই পথিক আত্মাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। বিদ্যুল্লোকে এরূপ এক জন দেবতার স্পষ্ট উল্লেখই আছে। সূত্রকার বলেন, পথিক আত্মা অচেতনাবস্থায় থাকে, তাহাকে কেহ না লইয়া গেলে সে চলিতে পারে না, সুতরাং যেমন বিদ্যুল্লোকে তেমনি পথের অন্যান্য স্থলেও চালক দেবতা চাই। একথার ভাবার্থ তো ঠিকই। উচ্চ সাধনপথে অভিজ্ঞ সাধক-দের উপদেশ একান্ত আবশ্যক। যাহা হউক্, রাজর্ষি চিত্রের দেবযান ও ব্রহ্মলোকের বিবরণে এই বর্ণনার রূপকত্ব আরো স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায়। ঋষি নিজেই অনেক স্থলে এবং তাঁহার ব্যাখ্যাকার শঙ্করানন্দ কয়েক স্থলে তাঁহাদের ব্যাখ্যা দ্বারা রূপক ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, আমাদের আনুমানিক ব্যাখ্যার অবসর বেশী রাখেন নাই। ঋষি বলিতেছেন,—"স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকম্ আগচ্ছতি স বায়ুলোকং স আদিত্যলোকং স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকম্। তস্য বা এতস্য ব্রহ্ম-লোকস্য আরো হ্রদো মুহূর্ত্তা যেষ্টিহা বিজরানদীল্যো বৃক্ষঃ সালজ্যং সংস্থানম্ অপরাজিতম্ আয়তনম্ ইন্দ্রপ্রজাপতী দ্বার-গোপৌ। বিভুপ্রমিতং বিচক্ষণাঽসন্দ্যমিতৌজাঃ পর্য্যঙ্কঃ প্রিয়া চ মানসী প্রতিরূপা চ চাক্ষুষী পুষ্পাণ্যাবয়তৌ বৈ জগা-ন্যম্বাশ্চাম্বায়বীশ্চাপ্সরসঃ। অম্বয়া নদ্যস্তমিত্থম্ বিদাগচ্ছতি তং ব্রহ্মাঽহাভিধাবত যম যশসা বিজরাং বা অয়ং নদীং প্রাপন্

ন বা অয়ং জরয়িষ্যতীতি। তং পঞ্চশতান্যপ্সরসাং প্রতিয়ন্তি শতং চূর্ণহস্তাঃ শতং বাসোহস্তাঃ শতং ফলহস্তাঃ শতং অঞ্জন-হস্তাঃ শতং মাল্যহস্তাঃ। তং ব্রহ্মালঙ্কারেণালঙ্কুর্ব্বন্তি। স ব্রহ্মালঙ্কারেণালঙ্কৃতো ব্রহ্মবিদ্বান্ ব্রহ্মাভিপ্রৈতি। স আগ-চ্ছত্যারং হ্রদং তং মনসাঽত্যেতি। তমিত্বা সংপ্রতিবিদো মজ্জন্তি। স আগচ্ছতি মুহূর্ত্তান্যেষ্টিহাংস্তে অস্মাদপদ্রবন্তি। স আগচ্ছতি বিজরাং নদীং তাং মনসৈবাত্যেতি। স আগ-চ্ছতীল্যং বৃক্ষং তং ব্রহ্মগন্ধঃ প্রবিশতি। স আগচ্ছতি সালজ্যং সংস্থানং তং ব্রহ্মরসঃ প্রবিশতি। স আগচ্ছত্য-পরাজিতম্ আয়তনম্ তং ব্রহ্মতেজঃ প্রবিশতি। স আগচ্ছতি ইন্দ্রপ্রজাপতী দ্বারগোপৌ তাবস্মাদপদ্রবতঃ। স আগচ্ছতি বিভু-প্রমিতং তং ব্রহ্মযশঃ প্রবিশতি। স আগচ্ছতি বিচ-ক্ষণাম্ আসন্দীম্।......সা প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞয়াহি বিপশ্যতি। স আগচ্ছত্যমিতৌজসং পর্য্যঙ্কম্। স প্রাণস্তস্য ভূতং চ ভবিষ্যচ্চ পূর্ব্বৌ পাদৌ। শ্রীশ্চেরা চাপরৌ।......তস্মিন্ ব্রহ্মাঽস্তে। তমিত্থংবিৎ পাদেনৈবাগ্র আরোহতি। তং ব্রহ্ম পৃচ্ছতি কোঽসীতি। তং প্রতিব্রূয়াৎ।...ত্বমাত্মাঽসি যস্তমসি সোঽহমস্মীতি।”—“তিনি দেবযান-পথ প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে অগ্নিলোকে, তৎপরে বায়ুলোকে, তৎপরে আদিত্য-লোকে, তৎপরে বরুণলোকে, তৎপরে ইন্দ্রলোকে, তৎপরে প্রজাপতিলোকে, তৎপরে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হন। এই ব্রহ্মলোকে ‘আর’ নামক হ্রদ, ‘বিজরা’নাম্নী নদী, ‘ইল্য’নামক

বৃক্ষ, 'সালজ্য' সংস্থান (অর্থাৎ সালবৃক্ষ সমান ধনুর্গুণতুল্য উপতীর-বিশিষ্ট জলাশয়যুক্ত নগর) এবং 'অপরাজিত' নামক মন্দির আছে, ইন্দ্র ও প্রজাপতি তাহার দ্বাররক্ষক। তথায় 'বিভু'নামক সভাগৃহ, 'বিচক্ষণা'নাম্নী আসন্দী (সভামধ্যবেদী), 'অমিতৌজাঃ' নামক পর্য্যঙ্ক, 'মানসী' নাম্নী (ব্রহ্মের) প্রিয়া (অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তি) এবং 'চাক্ষুষী' নাম্নী তাঁহার প্রতিরূপা (জীবাত্মা), যে দুজন পুষ্পের ন্যায় প্রাণীসকলকে বয়ন করিতেছেন, এবং জগজ্জননী শ্রুতি এবং অতুলনীয়া বুদ্ধি-বৃত্তিরূপিণী দেবকামিনী এবং 'অম্বয়া' (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানদায়িনী উপাসনারূপিণী নদীসমূহ) আছে। জ্ঞানী ব্রহ্মলোকের নিকটবর্ত্তী হইলে ব্রহ্ম তাঁহার সম্বন্ধে (সহচরীদিগকে) বলেন, 'ধাবিত হও এবং আমার যোগ্য সম্মানের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা কর। সে বিজরা নদী উত্তীর্ণ হইয়াছে, আর সে জরাগ্রস্ত হইবে না।' পাঁচ শত দেবকামিনী তাঁহার দিকে অগ্রসর হন—এক শত চূর্ণহস্তে, এক শত বস্ত্রহস্তে, এক শত ফলহস্তে, এক শত অঞ্জনহস্তে এবং এক শত মালা-হস্তে। তাঁহারা তাঁহাকে ব্রহ্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত করেন। সেই ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া ব্রহ্মাভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি 'আর' নামক হ্রদের নিকটে আসিয়া মনদ্বারা ইহা পার হন। যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ নহেন তাঁহারা ইহার নিকটবর্ত্তী হইয়া ইহাতে মগ্ন হন। তিনি 'যেষ্টিহা' নামক মুহূর্ত্তসমূহের নিকটবর্ত্তী হইলে উহারা তাঁহার নিকট হইতে

চলিয়া যায়। তিনি বিজরা নদীর নিকটবর্ত্তী হইয়া মন-দ্বারাই ইহা পার হন।......'ইল্য' নামক বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহাতে ব্রহ্মগন্ধ প্রবেশ করে। 'সালজ্য' নামক সংস্থানের নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহাতে ব্রহ্মরস প্রবেশ করে। 'অপরাজিত' নামক আয়তনের নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহাতে ব্রহ্মতেজ প্রবেশ করে। তিনি দ্বাররক্ষক ইন্দ্র ও প্রজাপতির সমীপবর্ত্তী হইলে তাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে সরিয়া যান। তিনি 'বিভু' নামক সভাগৃহে উপনীত হইলে তাঁহাতে ব্রহ্মযশ প্রবেশ করে। তৎপরে তিনি 'বিচক্ষণা'নাম্নী সভামধ্যবেদীর নিকটবর্ত্তী হন।......সেই বেদী প্রজ্ঞা, কারণ প্রজ্ঞাদ্বারাই সম্যক্ দর্শন হয়। তৎপরে তিনি অমিতৌজাঃ নামক পর্য্য-ঙ্কের নিকটবর্ত্তী হন। উহা প্রাণ। ভূত ও ভবিষ্যৎ উহার সম্মুখের পাদদ্বয়। (লৌকিকী) শ্রী ও পৃথিবী উহার পশ্চাতের পাদদ্বয়।......উহার উপর ব্রহ্ম আসীন। তত্ত্ববিৎ এই পর্য্যঙ্কে প্রথমে এক পাদদ্বারা আরোহণ করেন। তাঁহাকে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করেন 'তুমি কে?' ব্রহ্মবিৎ ইহার উত্তরে বলি-বেন......'তুমি আত্মা। তুমি যে আমিও সে।" (কৌষী ১।৪-৬) তৎপরে ব্রহ্ম আরো কতিপয় প্রশ্নদ্বারা ব্রহ্মবিদের জ্ঞান পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে বলিলেন, —'আমার এই জগৎ তোমার'। উদ্ধৃত বিবরণটীর রূপক এমন স্বচ্ছ যে অধিক ব্যাখ্যা নিষ্প্রেয়োজন বোধ হইতেছে। যাঁহারা ব্রহ্মসাধক, অথচ কাব্যরসজ্ঞ, শুষ্ক তার্কিক নহেন,

তাঁহারা সহজেই বুঝিবেন ইহা ব্রহ্মসাধনে ক্রমোন্নতির একটী অতি সুন্দর কবিত্বময় বর্ণনা। এই বর্ণনা ইহলোক পরলোক উভয় সম্বন্ধেই সত্য। অধিক ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন বলিলাম, কিন্তু ২।৪টী কথা বলিলে হয়তো কাহারো কাহারো সাহায্য হইবে। দেবযান পথ অর্থাৎ ব্রহ্মসাধন আরম্ভ হইলেও ব্রহ্ম-স্বরূপের সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করিতে সময় যায়। বহুদেববাদ, বহুদেবতার পূজা, ছাড়িলেও কিছু দিন মনে হয় কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের পূজিত অগ্নি, বায়ু বা রুদ্র, বিষ্ণু ইঁহাদের কেহই বুঝি ব্রহ্ম। সাধকের অগ্নিলোক প্রভৃতি নানা দেবলোকে যাইবার কথা বলিতে গিয়া বোধ হয় ঋষি এই একদেববাদের কথাই বলিয়াছেন। তার পরে 'আরো হ্রদঃ' যে রিপুদমন, চিত্তকে শুদ্ধ করা, তাহা সহজেই বোঝা যায়। ব্রহ্মপ্রেরিতা দেবকামিনী, অর্থাৎ 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' প্রভৃতি শ্রুতি এবং শ্রুতি বুঝিবার শক্তিরূপিণী বুদ্ধিবৃত্তি, এসকল ব্রহ্মা-লঙ্কারে অলঙ্কৃত না হইলে রিপুদমন হয় না, পথের অন্যান্য বাধাও দূর হয় না। 'যেষ্টিহা মুহূর্ত্তাঃ' বোধ হয় ইষ্টহানিকর সময়-ক্ষেপণ, অসাবধানে কাল কাটান, যে দোষ অনেক চরিত্রবান্ লোকের ভিতরেও দেখা যায়। 'বিজরা নদী' পার হওয়ার অর্থ চির-উদ্যমশীল হওয়া। 'ইল্যবৃক্ষে'র নিকটবর্ত্তী হওয়ার অর্থ পৃথিবীকে পার্থিব ভাবে না দেখিয়া ব্রহ্মভাবে, ব্রহ্মপ্রকাশরূপে, দেখিতে আরম্ভ করা। এই সময় হইতেই 'ব্রহ্মগন্ধ' পাওয়া যায়, ব্রহ্মদর্শন না হইলেও ব্রহ্ম স্পৃহনীয়,

আকর্ষণের বস্তু, হন। 'সালজ্য সংস্থানে'র জলাশয়গুলি উচ্চ পারযুক্ত, অর্থাৎ অতি গভীর জলপূর্ণ। সেই সংস্থানের নিকটবর্ত্তী হইলে অর্থাৎ প্রকৃতরূপে ব্রহ্মোপাসনা করিলে সাধকের ভিতরে 'ব্রহ্মরস' তো প্রবেশ করিবেই। আরো অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মের 'আয়তনের' নিকটবর্ত্তী হইলে 'ব্রহ্ম-তেজ' লাভ হয়, দুর্ব্বলতা দূর হয়, ইহাও উচ্চ সাধকের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। কিন্তু ব্রহ্মভবনের দ্বারে যাইয়াও কেহ কেহ গুরুকে ছাড়াইতে পারেন না, সাধ্যের কাছে সাক্ষাৎ ভাবে না যাইয়া শ্রেষ্ঠ সাধকের পূজা করেন। দ্বাররক্ষক ইন্দ্র-প্রজাপতির কথা এই অর্থেই বলা হইয়া থাকিবে। ইন্দ্র-প্রজাপতি কিন্তু সুবিবেচক গুরু, তাঁহারা শিষ্যের পথ আটক না করিয়া "তাঁহার নিকট হইতে সরিয়া গেলেন।" 'মানষী' ও 'চাক্ষুষী'র কার্য্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহার মর্ম্ম বোধ হয় এই যে ব্রহ্মধামে গেলে সৃষ্টির প্রক্রিয়া কিঞ্চিৎ বোঝা যায়। সৃষ্টি হইতে গেলে কেবল ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তি যথেষ্ট নহে, তাঁহার ভেদাভেদ স্বরূপে যে জীবভাব অন্তর্ভূত আছে তাহার জাগরণ চাই, এবং তাহার উপর ব্রহ্মশক্তির কার্য্য হওয়া চাই। আমাদের ষষ্ঠ ও সপ্তমাধ্যায়ে আমরা সেকথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। যাহা হউক্, এই ঋষির ব্যাখ্যাত মুক্তিবাদ যে পূর্ব্ববর্ণিত 'সদ্যোমুক্তি' ও 'নির্ব্বাণমুক্তি' হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, তাহা এখন পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন। ইহাতে মুক্ত জীব ব্রহ্মের সহিত একত্ব অনুভব

করিতেছেন অথচ "ত্বম্", 'অহম্' এরূপ ভেদাত্মক শব্দদ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। এই অবস্থায় যে অন্য জীবের সহিতও মুক্ত আত্মার ভেদবোধ থাকে, তাহাও বলা হইয়াছে। ব্রহ্মধামে ইন্দ্র-প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতার অর্থাৎ উন্নত সাধকের অস্তিত্ব স্বীকারই ইহার প্রমাণ। এই ভেদাভেদের 'উপরে' কোন অবস্থা আছে কিনা, যে অবস্থায় কোন ভেদ থাকে না, একথা ঋষি বলেন নাই। উপনিষদের যে যে স্থানে এরূপ ভেদাভেদাত্মক মুক্তির বর্ণনা আছে, তার কোন স্থলে কোন 'উচ্চতর' অবস্থার উল্লেখ নাই। ব্রহ্মলোকে গেলে আর ফিরিতে হয় না, একথা বলিয়া 'ছান্দোগ্য' উপনিষদ্ শেষ হইয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মলোক সম্বন্ধে মতদ্বৈধ

'ব্রহ্মসূত্র'ও এই কথা বলিয়া শেষ হইয়াছে। কিন্তু সূত্রকার সূত্রের শেষ দুই পাদে এই দুই প্রকার মুক্তিবাদীর অনৈক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। 'পরা' বা 'নির্ব্বাণ'মুক্তির পক্ষপাতীরা বলেন শাস্ত্রের বর্ণিত ব্রহ্মলোক নির্গুণ পরব্রহ্মের লোক নহে, সগুণ অপরব্রহ্মের অর্থাৎ ব্রহ্মার লোক। এই লোক প্রলয়ান্ত-স্থায়ী। প্রলয়ে অপরব্রহ্ম পরব্রহ্মে লীন হইবার সময়ে ব্রহ্মলোকস্থিত আত্মারাও পরব্রহ্মে লীন হইয়া তৎসহ অভিন্ন হইবেন। এমতের সপক্ষে সূত্রকার কোন শ্রুতি নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। আমাদের কাছে প্রশ্ন ৫।৫ এমতের পোষক বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক্, ব্রহ্মলোক পরব্রহ্মের লোক

কি অপরব্রহ্মের লোক এবিষয়ে সূত্রকার বাদরি ও জৈমিনির মত পরে পরে উল্লেখ করিয়াছেন। বাদরির মতে ব্রহ্মলোক অপরব্রহ্মের লোক, জৈমিনির মতে উহা পরব্রহ্মের লোক। সূত্রকার নিজ মত উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু পূর্ব্ব পক্ষ অপর পক্ষের মতভেদ স্থলে সূত্রকার অপর পক্ষের মতই অবলম্বন করেন, এই ন্যায়ে জৈমিনির মতই তাঁহার মত বলিয়া বোধ হয়। সগুণ-নির্গুণ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যাহা বলিয়াছি তাহা গ্রহণ করিলে এই লোকভেদের বিচার অর্থহীন বলিয়া বোধ হইবে। যাহা হউক্, সূত্রকার তাঁহার শেষ অধ্যায়গুলিতে, বিশেষতঃ ষোড়শ অর্থাৎ সর্ব্বশেষ অধ্যায়ে, ইন্দ্র, প্রজাপতি, প্রবাহণ, চিত্র প্রভৃতি বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী ঋষিদের প্রভাবান্বিত হইয়াই মুক্তিবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি ব্রহ্মের সহিত মুক্তা-ত্মার মৌলিক অভেদ, 'অবিভাগ', এবং 'ভোগমাত্রে' 'সাম্য' স্বীকার করিয়াও সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে জীবের জ্ঞান ও শক্তি অস্বীকার করিয়াছেন।

গীতার মুক্তিবাদ

ভগবদ্গীতাকারের মুক্তিবাদ স্থির করা কঠিন। তিনি গীতার শেষ পর্য্যন্ত কৃষ্ণার্জ্জুনে অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীবে ভেদ রক্ষা করিয়াছেন, ইহাতে বোধ হইতে পারে যে তাঁহার উপদিষ্ট মুক্তিতে বরাবরই ভেদ থাকিবে। কিন্তু তাঁহার বর্ণিত মুক্তি তো জীবন্মুক্তি। দেহান্তে কিরূপ মুক্তি হইবে তাহা ইহাতে স্থির হয় না। দ্বাদশাধ্যায়ে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলি-

তেছেন, "নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়" (৮) অর্থাৎ "পরলোকে তুমি আমাতে বাস করিবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই"। এই কথাতেও ভেদাভেদ মুক্তিরই আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু গীতাকারের উপর প্রবল সাংখ্যপ্রভাব দেখিয়া আশঙ্কা হয় যে তাঁহার অভিপ্রেত মুক্তি সাংখ্যের কৈবল্য হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে। তাঁহার পঞ্চদশাধ্যায়ে তিনি বলিয়াছেন ব্রহ্ম হইতে প্রসূত সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষ অসঙ্গ-শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া পরম পদ অন্বেষণ করিতে হইবে। সেই পরম পদে কি নাই, সে সম্বন্ধে তাঁহার মত স্পষ্ট, কিন্তু কি আছে, সেবিষয়ে তিনি কিছুই বলেন নাই। তাঁহার বর্ণনার সেই অভাব রাজর্ষি চিত্রের বর্ণনায় দূর হইয়াছে। গীতাকার তাঁহার গ্রন্থে এবর্ণনা গ্রহণ করেন নাই, এরূপ অন্য কোন বর্ণনাও দেন নাই। কিন্তু তিনি এরূপ বর্ণনার বিপক্ষেও কিছু বলেন নাই। যাহা হউক্, পরম পদ সম্বন্ধে গীতাকারের শ্রুতিমধুর শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই অধ্যায় ও এই গ্রন্থ শেষ করি।

"অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম্
অসঙ্গশস্ত্রেন দৃঢ়েন ছিত্ত্বা।
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ॥
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তি প্রসৃতা পুরাণী॥

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখ-সংজ্ঞৈ
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥
ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥"

—"এই অতি কঠিন মূলযুক্ত অশ্বত্থকে অনাসক্তিরূপ দৃঢ় অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া তৎপরে সেই পদ অন্বেষণ করিতে হইবে যেখানে গেলে আর লোক ফিরিয়া আসে না। [এই ভাবে সেই পদ অন্বেষণ করিতে হইবে,—] 'এই পুরাতন জগৎপ্রবাহ যাঁহা হইতে প্রবাহিত হইতেছে সেই পরম পুরুষের শরণ লই'। যাঁহারা অভিমান ও মোহ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, আসক্তি দোষ যাঁহারা জয় করিয়াছেন, অধ্যাত্মবিষয়ে যাঁহারা নিষ্ঠাবান্, যাঁহাদের কামনা নিবৃত্ত হইয়াছে, সুখদুঃখ-নামক দ্বন্দ্ব হইতে যাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন, সেই জ্ঞানীগণ সেই পরম পদ প্রাপ্ত হন। সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি সেই পদকে প্রকাশ করিতে পারে না। যেখানে গেলে লোক আর ফিরিয়া আসে না, তাহাই আমার পরম ধাম। (১৫।৩-৬)

ওঁ ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

পরিশিষ্ট

'ঋষিপরিচয়ে' ভ্রমক্রমে 'তৈত্তিরীয়' উপনিষদুক্ত ঋষিদের পরিচয় দেওয়া হয় নাই। 'তৈত্তিরীয়' উপনিষদ্ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত। এই বেদের অপর নাম 'তৈত্তিরীয় সংহিতা'। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তক বৈশম্পায়নের শিষ্যদের মধ্যে সম্ভবতঃ এক জনের নাম ছিল তিত্তিরি। তাঁহার নামেই এই সংহিতা এবং এই উপনিষদ্ প্রসিদ্ধ। এই উপনিষদ্ তিনটি বল্লী বা অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথমাবল্লী বা শিক্ষাধ্যায়ে প্রথমতঃ আরণ্যক সাহিত্যের অনুযায়ী কতিপয় 'ধ্যান' বিহিত হইয়াছে। বিষয় প্রধানতঃ নানা শক্তি, ব্যাহৃতি ও প্রণব। দ্বিতীয়তঃ বেদাধ্যায়ীর প্রতি কতিপয় মূল্যবান্ নৈতিক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমাংশের শেষে পৌরুশিষ্টি, নাক মৌদ্গল্য ও ত্রিশঙ্কু, এই তিন জন ঋষির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। 'ব্রহ্মানন্দবল্লী' নামক তৃতীয়াধ্যায়ে অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ, আত্মার এই 'পঞ্চ কোষ' বর্ণিত হইয়াছে এবং ব্রহ্মানন্দের 'মীমাংসা' করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী বৈদান্তিক সাহিত্যে এই দুটী বিষয়েরই বহুল ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। এই অধ্যায়ে কোন ঋষির উল্লেখ নাই। 'ভৃগুবল্লী' নামক তৃতীয়াধ্যায়ে দেবর্ষি বরুণ তদীয় পুত্র ভৃগুকে পঞ্চকোষ-বর্ণিত পঞ্চ স্তর অবলম্বন করিয়া

ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন। এই উপদেশের নাম 'ভার্গবী বারুণী বিদ্যা'। অধ্যায়ের শেষ ভাগে অন্নসঞ্চয়, অন্নদান এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে কতিপয় উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। পঞ্চকোষ ও ভৃগুবারুণী বিদ্যা আমাদের প্রণীত 'Hindu Theism'এ বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

লেখকের সম্পাদিত শাস্ত্র-গ্রন্থ

1. **The Ten Upanishads**: *Ísá, Kena, Katha, Prasna, Mundaka, Màndùkya, Svetàsvatara, Taittiriya, Aitareya and Kaushitaki* in Devanagar characters with short and easy Sanskrit annotations and an English translation. Second revised edition. ... ... **Rs. 2-8.**

2. **The Bhagavadgita** in Devanagar characters with short and easy Sanskrit annotations and English translation by the Editor and Pandit Srishchandra Vedantabhushan, B.A., and an English introduction by the Editor containing among other things an expository and critical summary of the contents. ... ... **Rs. 2-8.**

3. **The Brahma Sutras** in Devanagar characters with short and easy Sanskrit annotations, an English commentary by the Editor, giving an expository and critical summary of the contents and English translation of the *Sùtras* and the annotations by the Editor and Babu Satischandra Chakravarti M.A. ... ... **Rs. 4.**

4. **উপনিষদ্**—ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, শ্বেতাশ্বতর, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও কৌষীতকি। সরল সংস্কৃত টীকা ও মূলের বঙ্গানুবাদ সহ। দুই খণ্ড একত্র বাঁধান ২৷৷০। প্রতি খণ্ড স্বতন্ত্র ১৲।

5. **ছান্দোগ্য উপনিষদ্**—পণ্ডিত মহেশচন্দ্র বেদান্তরত্ন বি-টি-কৃত সটীক পদপাঠ ও মূলের বঙ্গানুবাদ এবং সম্পাদক-কৃত উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদের দার্শনিক ভিত্তি ও সাধন-প্রণালী-বিষয়ক ভূমিকা সহ। মূল্য ২৷৷০।

6. **বৃহদারণ্যক উপনিষদ্**—পণ্ডিত মহেশচন্দ্র বেদান্তরত্ন বি-টি-কৃত সটীক পদপাঠ ও মূলের বঙ্গানুবাদ এবং সম্পাদক-কৃত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের দার্শনিক মতবিষয়ক ভূমিকা সহ। মূল্য ২৷৷০। ৪-৬ সংখ্যক পুস্তক একত্র লইলে মূল্য ৬৲।

লেখকের প্রণীত গ্রন্থ



1. **Brahmajijnasa** (in English) : An Exposition of the Philosophical Basis of Theism. ... **Re. 1-8.**

2. **Brahmasadhan** or Endeavours after the Life Divine (in English) : Twelve lectures on spiritual culture. ... ... **Re. 1-8.**

3. **The Philosophy of Brahmaism** : Twelve lectures on Bráhma doctrine, *sàdhan* and social ideas. Second revised edition. ... **Rs. 2-8.**

4. **The Vedanta and its Relation to Modern Thought*** : Twelve lectures on all aspects of Vedantism. ... ... **Rs. 2-4.**

5. **The Theism of the Upanishads and Other Subjects** : Six lectures on Upanishadic Theism and the religious views of Hegel. Dayal Singh College, Lahore. ... ... **Rs. 2/-**

6. **Krishna and the Gita*** : Twelve lectures on the authorship, philosophy and religion of the *Bhagavadgità* ... ... **Rs. 2-8.**

7. **Krishna and the Puranas** : Essays on the origin and development of Vaishnavism. **Re. 1-4.**

8. **Hindu Theism*** : A Defence and Exposition. **Re. 1-8.**

9. **ব্রহ্মজিজ্ঞাসা**—ব্রহ্মবাদের দার্শনিক প্রমাণ ও ব্যাখ্যা। সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ১৲।

10. **অদ্বৈতবাদ**—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়। মূল্য ১৲।



লেখকের প্রণীতা পুস্তিকা

1. **Pancharshi** : or the Founders of Vedic Idealism. **As. 8/-**
2. **Evidences of Theism** : The fourfold proof of God's Existence. ... ... **As. 4/-**
3. **The Religion of Brahman*** : Or the creed of educated Hindus. ... ... **As. 8/-**
4. **Gleams of the New Light*** : Essays in exposition of some leading principles of Pure Theism, doctrinal and practical. Second edition. **As. 5/-**
5. **The Roots of Faith*** : Essays of the grounds of belief in God and in criticism of Scepticism and Agnosticism. ... ... **As. 5/-.**
6. **Whispers from the Inner Life*** : Essays on Theistic Ideals and Experiences. ... **As. 4/-.**
7. **The Fundamental Principles of Brahmaism.** Sadharan Brahma Samaj Office. ... **As. 2/-**
8. **Thirsting after God*** : Prayers offered in times of private devotions. Sadharan Brahma Samaj Office. ... ... **As. 2/-.**
9. **A Manual of Brahma Ritual and Devotions** Sadharan Brahma Samaj Offiice. ... **As. 8/-.**
10. **Our Wants and their Supply** : Presidential Address. Sadharan Brahma Samaj Office. **As. 4/-.**
11. **Pandit Sivanath Sastri** : His Life and Teachings. ... ... **As. 4/-.**

12. **The Philosophy of Sankaracharya** (in Natesan's 'Sri Sankaracharya'). Natesan & Co., Georgetown, Madras. ... ... **Re. 1/-.**

13. **Sankaracharya** : His Life and teachings*. **As. 8/-.**

14. **Maitreyi** : A Vedic story. Second edition. Natesan & Co. ... ... **As. 4/-.**

15. **ব্রাহ্মধর্ম্মশিক্ষা**—(বালক বালিকার উপযোগী) দ্বিতীয় সংস্করণ। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ কার্য্যালয়। মূল্য ।৵০।

16. **সাধনবিন্দু***—সাধন-বিষয়িণী প্রবন্ধাবলী। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ।০।

17. **ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক ইতিবৃত্ত**—সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ কার্য্যালয়। মূল্য ৵০ আনা।

18. **নবপ্রেম-সাধনা**—মাঘোৎসবের উপদেশ। মূল্য ⁄১০।

19. **চিন্তাকণিকা**—ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ বিষয়ক প্রবন্ধ। দ্বিতীয় সংস্করণ। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ কার্য্যালয়। মূল্য ⁄০।

Theism as Life and Philosophy : Being a Compendium of the Teachings of Pandit Sitanath Tattvabhushan, by Prof. Dhirendranath Vedantavagis, M.A. Cloth **As. 12/-.** Paper cover **As. 8/-.**

*Out of print at present.

To be had, unless otherwise stated, of the Author and Editor at the Devalaya, third storey, 210-3-2, Cornwallis Street, and of Messrs. Chakravarti Chatterjee & Co., 15, College Square, Calcutta.

